আমার কথা

কথক॥ ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

অনুলেখক॥ শুভময় ঘোষ

আমার কথা

কথক : ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ
অনুলেখক : শুভময় ঘোষ

রত্নসাগর গ্রন্থমালা

রত্নসাগর গ্রন্থমালা—১৩

প্রথম প্রকাশ

১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রকাশক

দেবকুমার বসু

৭ জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণলিপি

চারু খাঁ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ডি, সি, বোস এণ্ড কোং

কলিকাতা—১৩

মুদ্রণ

ঘোষ আর্ট প্রেস

শ্যামসুন্দর ঘোষ

১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭

পরিবেশক

গ্রন্থজগৎ

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

—দেড় টাকা—

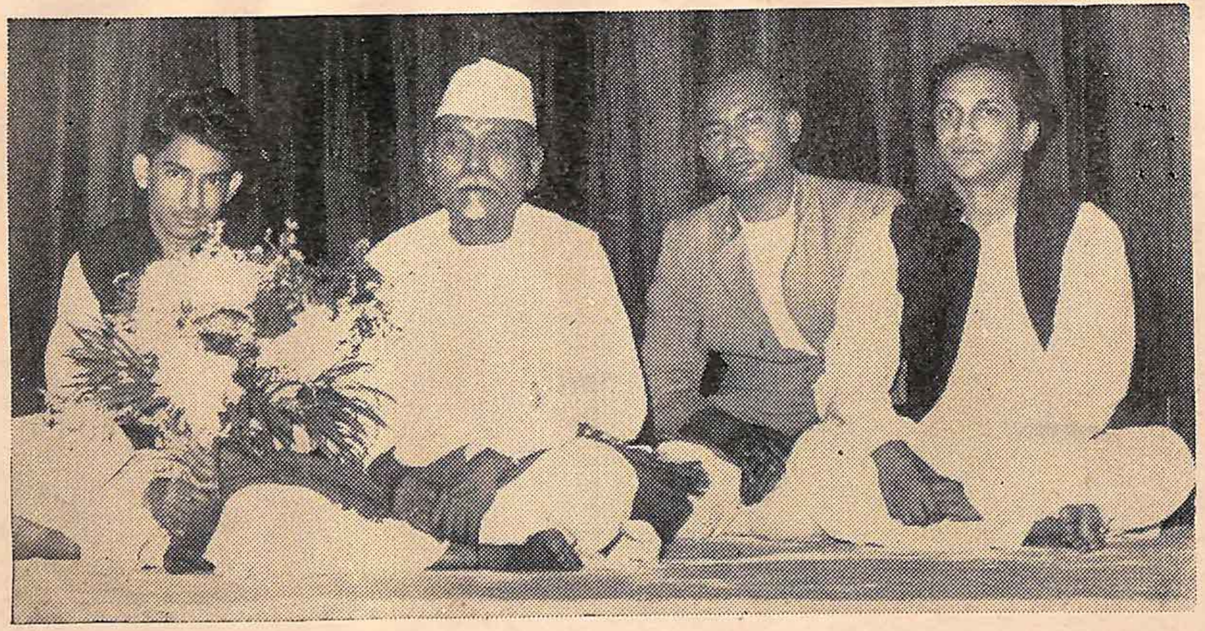


বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 'রত্নসাগর গ্রন্থমালার' উদ্দেশ্য। সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস!

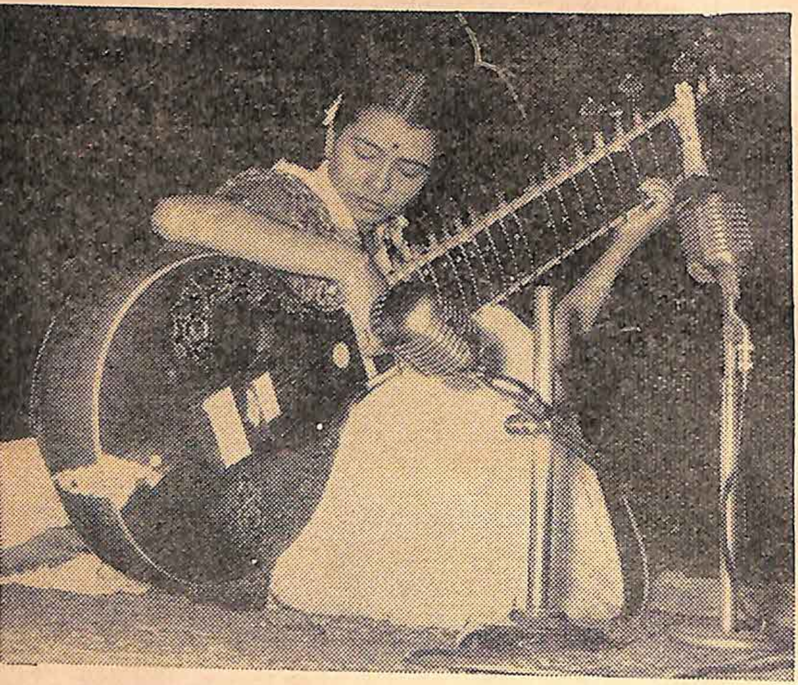
সম্পাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
মনোজ ভট্টাচার্য্য
দেবকুমার বসু

এই বই ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়, তাঁর সংগীত শিল্পের আলোচনাও নয়। তবে এখানে তাঁর জীবনের মূল সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে, আর প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সংগীতসাধনার ইতিবৃত্ত। বিশ্বভারতী ১৯৫২ সালে এই সংগীতগুরুকে দ্বিজেন্দ্র অধ্যাপক পদে আহ্বান জানিয়ে শান্তিনিকেতনবাসীদের তাঁর সংগীত ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার মহৎ সুযোগ দিয়েছিলেন। শান্তি-নিকেতনে ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ দুমাস ছিলেন। দুমাসে সংগীত-শিক্ষার সূচনাও হয় না, কিন্তু সংগীত সাধক আল্লাউদ্দীনের সান্নিধ্যই শিক্ষাপ্রদ। তাঁর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা, আলাপ আলোচনা, ভারতীয় সংস্কৃতির এক দুর্লভ রত্নের সন্ধান পেয়েছিল। এই সান্নিধ্যের স্মৃতি তাদের প্রত্যেকের জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিনীত—

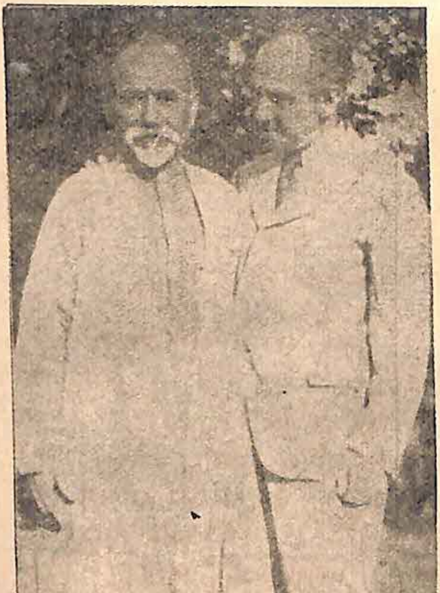
শুভময় ঘোষ



আল্লাউদ্দীন খাঁ, আলী আকবর খাঁ, আশীষ খাঁ ও রবিশঙ্কর



কন্যা অন্নপূর্ণা



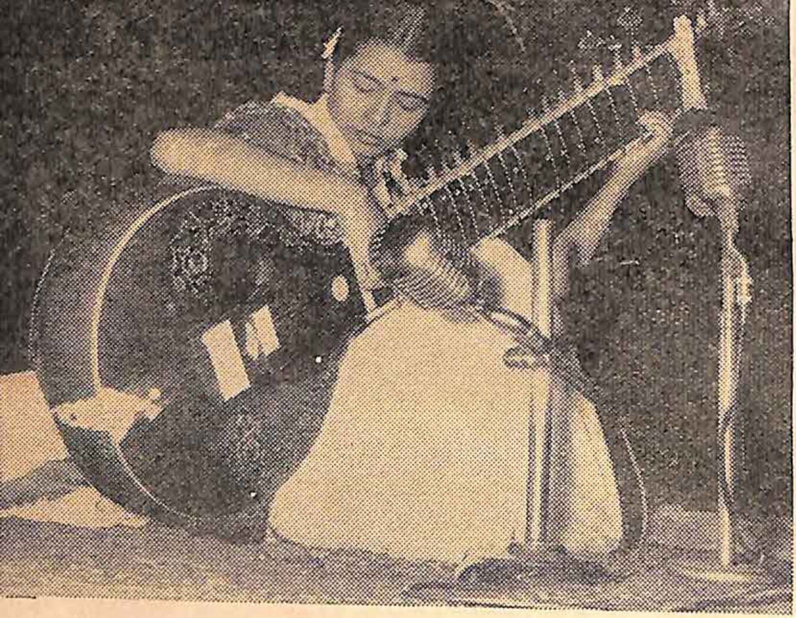
আল্লাউদ্দীন খাঁ ও বিখ্যাত
রুশ অভিনেতা চেখভ



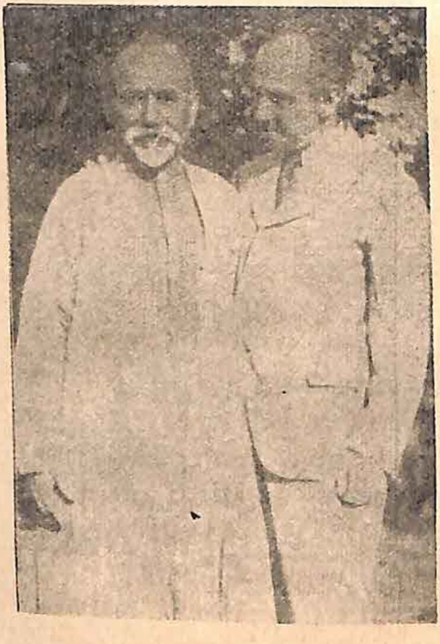
পুত্র আলী আকবর



আল্লাউদ্দীন খাঁ



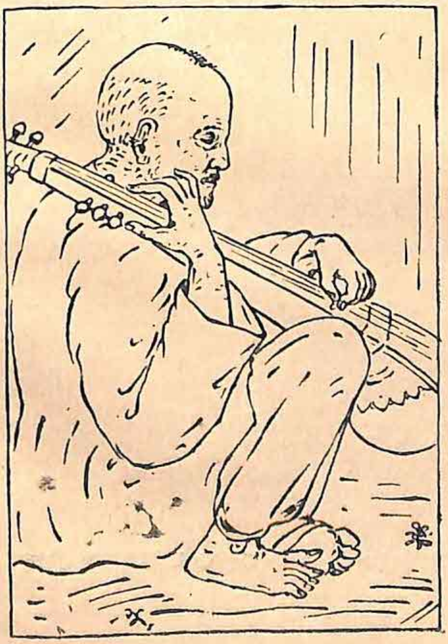
কন্যা অন্নপূর্ণা



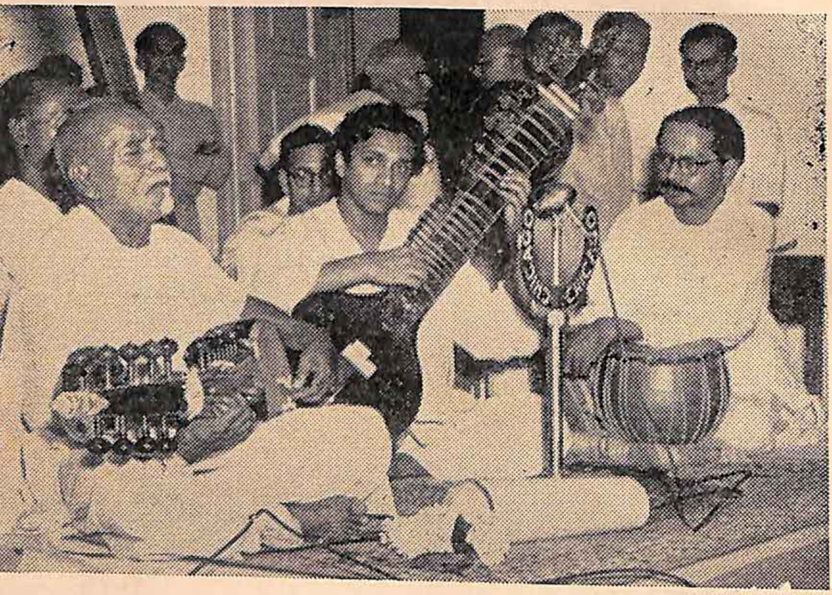
আল্লাউদ্দীন খাঁ ও বিখ্যাত
রুশ অভিনেতা চেখভ



পুত্র আলী আকবর



আল্লাউদ্দীন খাঁ



আল্লাউদ্দীন খাঁ, রবিশঙ্কর ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

[২৩শে অক্টোবর তারিখ সকালে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন ফিরছি। বোলপুরে বাসের কাছে খুব ভীড়। দেখলুম, তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধ। পিঠে কাপড়ের খোলে জড়ান বাজনা। সঙ্গে একটি প্রিয়দর্শন ছোট ছেলে, তার কাঁধেও একটি বাজনা। ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ। সঙ্গে তাঁর নাতি আলী আকবর খাঁর ছেলে, আশিস্ খাঁ। যত্ন করে বাজনা দুটি তুলে বৃদ্ধ বসলেন। বাসে সবার সঙ্গে নিজে থেকেই আলাপ করে নিলেন। কথায় পূর্ববঙ্গের ছাপ এখনও খুব বেশী। আগেও এসেছেন শান্তিনিকেতনে। "তখন গুরুজী ছিলেন। আবিসিনিয়ার তখন যুদ্ধ ছিল। ইউরোপ যাব, তার আগেই এখানে ছিলাম। যখন যাব তখন গুরুজী বল্লেন, 'নন্দলাল! আল্লাউদ্দীনের মাথাটা রেখে দাও!' নন্দবাবুর এক ছাত্র (শ্রীরামকিংকর) আমার মাথাটা রেখে দিল মূর্তিতে। তখন, আরও দাড়ি ছিল। নন্দবাবু ভাল আছেন?" বাসে বসে বসেই খবর নিলেন থাকা খাওয়ার কী ব্যবস্থা। "রুটি পাওয়া যাবে ত? আমি বাবা দিনে বাঙালী। রাত্রে পশ্চিমা।"

ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন আছেন সঙ্গীত ভবনের নতুন হস্টেলে। পুরো বাড়িটা তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রোজ সন্ধ্যায় যখন নাতিকে তালিম দেন, সবাই আসে শোনে। অত্যন্ত আমুদে, আলাপী, অমায়িক, বিনয়ী লোক। চমৎকার কথা বলেন। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুজব, গান অনেক কিছু হয়। তাঁর গল্প, তাঁর বাজনার মতই মনোহর। হাসি এবং রসিকতায় ভরা। এই কয়দিন ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন নিজের মুখে তাঁর জীবনের গল্প বলেছেন। আল্লাউদ্দীনের নিজের জবানীতে তাঁর জীবনী শুনুন।—অনুলেখক]

প্রথম আসর

আপনারা 'দেবীচৌধুরাণী' জানেন ত? 'ভবানী পাঠক'—আমার পূর্বপুরুষেও এক 'ভবানী পাঠক' ছিলেন। দীননাথ দেবশর্মা—

মুলুকগ্রামে তাঁর বাড়ী। দেবশর্মা,—কী? ব্রাহ্মণ ত? হ্যাঁ, তাই ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি ছেলেকে নিয়ে গৃহত্যাগী হলেন। সেই বনে পাহাড়ে চলে গেলেন। কুকীদের দেশে। কুকী জানেন ত? তারা মানুষ খায়—এই যেমন আপনাদের সাঁওতালরা। তারা ত অনেক সভ্য হয়েছে কুকীরা এখনও অসভ্য। তারা—বাবা মা বুড় হলে তাদের খেয়ে ফেলে। বলে—বাবা মা আমাদের পেটে রেখেছিলেন, এবার আমরা তাঁদের পেটে রাখি। সেই কুকীদের মধ্যে গিয়ে দীননাথ বাস করলেন। কালীমন্দিরে কালীপূজা করেন। কুকীরা তাঁকে খুব ভয় পায়, ভেট এনে দেয়। দীননাথ সাধু প্রকৃতির লোক। তাঁর ছেলেকে সংস্কৃত পড়ালেন, বাঙলা পড়ালেন। ছেলে কিন্তু কুকীদের সঙ্গে পার্টি করল—এই যেমন কংগ্রেস-পার্টি তেমনি। তিনি ইংরাজের খাজানা লুট করতেন। আর যত অত্যাচারী জমিদার, যারা প্রজার রক্ত শোষণ করে, তাদের টাকা লুট করে গরীবদের দান করেন। তারপর যখন ক্লাইভ সায়েব যুদ্ধ জিতলেন, তখন ইংরাজরা পুরস্কার ঘোষণা করল—এই সব ডাকাতদের ধরে দিলে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে। তিনি তখন মুসলমান হয়ে গেলেন—নাম পাল্টে নিলেন। সিরাজু ডাকাত। তাঁর বাবা দীননাথ তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। একদিন সিরাজু ডাকাত শিলেটে এক জমিদারের কাছে চিঠি পাঠালেন, 'অমুক তারিখে যাব, এত টাকা দিতে হবে'। সেদিন ত তাঁর দলবল নিয়ে সিরাজু ডাকাত গেলেন সেই জমিদার বাড়ি। গিয়ে দেখলেন সব ফাঁকা, বিলকুল ফাঁকা। ঘরে ঢুকে দেখলেন কেউ নেই—কেবল এক পালংকে এক শিশু মেয়ে শুয়ে আছে। সিরাজু সেই মেয়েকে নিয়ে আসলেন তাঁর সঙ্গে। তাঁর নিজের ছেলের সঙ্গে তাকেও পাললেন। পরে সেই ছেলের সঙ্গেই তাঁর বিয়া দিলেন। সিরাজু নতুন জীবন শুরু করলেন। শিবপুর (ত্রিপুরা) এসে বাড়ি করলেন, জমিজমা করলেন। সিরাজু ডাকাতের ছেলের আবার তিন ছেলে—আলী আহম্মদ, সালী আহম্মদ আর জাফর মহম্মদ। জাফরের ছেলে মাদার হোসেন। তাঁর ছেলে সত্ত্ব খাঁ

(দীনের বাবা)। তিনি সাধু প্রকৃতির ছিলেন বলেই সাধু থেকে সদু খাঁ নাম। তাঁর আবার পাঁচ ছেলে দুই মেয়ে—শমীরুদ্দীন, আফতাবউদ্দীন, আল্লাউদ্দীন, নায়েবউদ্দীন হায়াত আলী—হায়াত ত ছিল শান্তিনিকেতনে। আমার বড় দিদি, সর্বজ্যেষ্ঠ—তাঁর নাম মধুমালতী। 'আর আমার মার নাম সুন্দরী—বড় ভাল নাম। শিবপুরের শিব—তাঁর নামেই গ্রামের নাম—জাগ্রত দেবতা। সব মানস পূর্ণ হয়। রাজা কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী একবার চেয়েছিলেন তাঁকে উঠিয়ে নিজের গ্রামে নিয়ে যেতে। পাঁচশ হাতিতে টানল। কিন্তু একটুও নড়ল না। স্বপ্ন দিলেন রাত্তিরে—"আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর না।" রাজা কৃষ্ণকিশোর তখন সেইখানেই মন্দির করলেন, দেবত্র সম্পত্তি দিলেন। হিন্দুমুসলমান যেই হোক, বাগানের প্রথম তরকারি, নতুন গাইয়ের দুধ আগে শিবকে দেবে। সেই শিববাড়িতে শিশুকালে খেলতাম, সবাই বলত শিবও খেলতেন আমাদের সঙ্গে। তাঁকে চিনতুম না। বড় বড় সাধু সেখানে গাঁজা খেত, গান করত, সেতার বাজাত। আমার শিশুকাল থেকেই সাধু সন্ন্যাসী ভাল লাগত। মা আমাকে ইস্কুলে পাঠাতেন আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে, বগলে বই নিয়ে বেরতুম। চলে যেতুম শিববাড়ি। সেতার শুনি, আবার ছেলেদের সঙ্গে বাড়ি ফিরি। আমার বাবা ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। কাশেম আলী খাঁ আমার গুরুর মামা। উজীর আর মামা, আগরতলার রাজসভায় আছেন। আমাদের বাড়ী থেকে ২০।২২ মাইল দূরে। চারা-বাড়ির চাল, ঘি (খুব ভাল চাল হত আমাদের বাড়িতে) মুর্গী, খাসি ভেট দিতেন খাঁ সাহেবকে। কাশেম আলী সব শুনে একদিন বল্লেন, "২০ মাইল দূরে থেকে হেটে আস?" "হ্যা খাঁ সাহেব, তোমার বাজনা শুনে পাগল হয়ে যাই।" "শিখবে? যদি পেশাদার না হও তবে এস, শেখাব।" "আমার বয়স গেছে। শিখতে পারব?" "আলবৎ হবে। তোমায় সেতার শেখাব।" (এই সময় শ্রোতাদের কেউ জিজ্ঞেসা করলেন, 'আপনার বাবার তখন কত বয়স?' উত্তরে বল্লেন, 'আমি তখন মায়ের পেটে। বয়সটা জিজ্ঞেস করতে

ওস্তাদের কাছে শানাই, নাকাড়া, টিকারা। আড়াই বছর শিখলাম। বড় অহংকার হল। মুক্তাগাছার জগৎকিশোর আচার্যের কাছে অনেক বড় ওস্তাদ যান। কর্নেট, শানাই, বেহালা নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তখন পূজা। কর্নেটটা ভাল বাজাতাম। পুকুরপাড়ে সন্ধ্যায় রাজা বেড়াচ্ছেন। "কী চাও?" "আজ্ঞে সাত বচ্ছর সুর সেধে এত বিদ্যা শিখেছি। বাঙলাতে ত নেই-ই, ভারতবর্ষেও আমার মত ওস্তাদ নেই।" "ব্যাটা কি পাগল হয়েছে নাকি? কী যন্ত্র বাজাও?" "পৃথিবীর সব বাজনা বাজাতে পারি।" থিয়েটারের কুসঙ্গে এই শিক্ষা। "সকাল ৮টায় আসবে।" ৮টা ত ৭টাতেই চলে গেলাম। দেখলাম বড়-সুন্দর-দাড়ি একজন সরোদের তরফ মিলাচ্ছেন; রাজা পাত্রমিত্র সব বসে আছেন। তোড়ীর সুর বাঁধছেন—আর আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। যেই যন্ত্রটা বেঁধে নিখাদ থেকে সা পর্যন্ত একতান দিয়েছেন—আর হো হো করে কেঁদে উঠলাম। যখন শেষ হল—কাঁদতে কাঁদতে পা-টা জড়িয়ে ধরলাম—"আপনি আমার গুরু। আপনার রান্নাবান্না ঘর ঝাঁট দেওয়া যাবতীয় সব কাজ করব। আমাকে এমন বাজনা শিখিয়ে দিন।" "রো মৎ" রাজা বল্লেন. "এখনই সাকৃরেদ্ করে দেব তোমাকে।" সেদিনই সাকৃরেদ্ হলাম। তখন বয়স আমার ১৬।১৭ হবে। ওস্তাদের নাম আহমদ্ আলী। রামপুরের। আবেদ আলীর ছেলে। এঁর পূর্বপুরুষ, বাহাদুর শাহ-র কাছে ছিলেন। আহমদ্ আলী চাকরি করতেন ঘুঘুডাঙ্গায় ছলিচাঁদ মারওয়ারির কাছে—গণপৎ রাও, বাদল খাঁ, তারাবাঈর মত গুণীরাও এঁর আসরে আসতেন। প্রথমে আহমদ্ আলী রুটি মাংস পোলাও রাঁধতে শেখালেন। পাক করতে পারতেন ভাল। আমি মাংস খাই না—মাঝে মাঝে রুটি মাংস কাঁচা থাকত।

সারেগামা যা বাজাতে দিলেন, সব এক বছরেই ঠিক হ'ল। আহমদ্ আলী যেখানে যেখানে বাজাতে যেতেন আমিও যেতাম। ওঁর সঙ্গে তবলা.বেহালা বাজিয়ে ২৫।৩০টাকা পেতাম। তাঁর টাকাও আমার কাছে রাখতেন। দরকারের সময় চাইতেন। যা বাজান, শুনি। সকালে চা খেয়ে আহমদ্ আলী চলে যেতেন কলকাতায়।

আমি রাঁধার সময়, রান্নঘরে বসে' তাই বাজাই—চুরি করে। চার বছর পূরা এই করলাম। একদিন তোড়ি বাজাচ্ছি। আহমদ্ আলী ফিরে এসে এক ঘণ্টা বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলেন। তারপর দরজায় টোকা দিলেন—"তুম্ চোর হ্যায়, ডাকু হ্যায়। (ডাকাতের বংশধর আমি, মার থেকে টাকা চুরি করেছি, বিদ্যা চুরি ত করবই), বেরও!" বলি, "আমি আর করব না। কিন্তু বলুন এ সব বাজনা কি খারাপ?" "হাত তৈরী কর আগে। রেওয়াজ কর।" ওর সঙ্গে একবার পাটনা, বনারস গেলাম। দুজায়গাতেই হাজার ৪।৫ টাকা জমল। "চল রামপুর।" গেলাম। খোলার বাড়ি মাটির দেওয়াল। আমাকে রাখলেন দূরে পায়খানার কাছে, এক ঘরে। গন্ধে কষ্ট পাই আর ওস্তাদ জিজ্ঞেস করেন, "আল্লাউদ্দীন চা খাও, কষ্ট হয় নি ত?" "আজ্ঞে গন্ধে…।" এঁর মধ্যে ওস্তাদের মার সঙ্গে একদিন দেখা হল। তারপর ওস্তাদকে বল্লাম, "গুরুদেব, আপনার সব পয়সা যা দিতেন, তার হিসেব নিন।" "আছে নাকি কিছু? আমার আগের চাকররা ত কখনও কিছু ফেরত দেয় নি। তারা বলত সব খাওয়ার বাবদে খরচ হয়ে গেছে।" দিলাম, বাক্স ভর্তি সব মোহর। (আমারটাও দিলাম গুরুদক্ষিণা। তাছাড়া কাঙালী ভোজনটা তখন বন্ধ হয়েছে কিনা, ওঁর কাছেই খাই।) গুরুর মা বলেন, "এ ত দেবতা? আর কেউ কি কখনও ফেরত দিত?" বাবা মা দুজনেই খুব খুসি হলেন। তখন আরেকটা একটু ভাল ঘরে জায়গা পেলাম। কাপড় সেলাই করে পরি। মোটা রুটি খাই। দিন দশ বাদে একদিন দেখি গাড়ি ভর্তি ইঁট আসছে। "আল্লাউদ্দীন, ইঁটগুলো নামাও।" কী কুক্ষণেই দশ হাজার টাকা ফেরৎ দিয়েছিলাম তাই দিয়েই ত নতুন বাড়ি উঠছে। তারপর চুন সুরকি মিস্ত্রী এল—'আল্লাউদ্দীন, একটু হাত লাগাও।" "হ্যাঁ, গুরুজী, জরুর" বলে হাত লাগালাম। ইঁট বয়ে—শূল রোগ হল—এখনও আছে। (তোমরা বাবা সব ভাল করে বাজনা শিক্ষা কর। গুরুজী ইস্কুল করেছেন। গুণী ব্যক্তিদের

পারি নি'।) বাবা সংসার দেখতেন না। মা দেখতেন, মা খুব রাগী লোক ছিলেন। মা কিছু জিজ্ঞেস করলে বাবা বলতেন, "ও পাপের সম্পত্তি আমি চাই না।" বাবা সেতার বাজান। আমার তখন দেড় বছর বয়স। বাবার বাজনা শুনি, আর মার বুকে তবলা বাজাই। এই ইমনের গৎ শুনুন—বাবা বাজাতেন। এ ঢঙের গৎ আর কোথাও শুনিনি। গুরুকে শোনাতে গুরু লাফিয়ে উঠলেন, "আরে, এত আমাদের গৎ। আমার গৎ। কোথায় পেলে তুমি?" এ° জিনিস জগতে কোথাও পাবে না। (আরেকটা গৎ শোনালেন, হাত নেড়ে নেড়ে, ঝোঁকের মাথায় হাতে করে ·কিছু দেওয়ার ভঙ্গীতে)। পরিবেশন, পরিবেশন করছে,—বলছে, একটু খান আপনি একটু খান আপনি। তারপর এই ঢিমে ছায়ানট (আশিস্ জায়গা ছেড়ে উঠতে, হেসে বল্লেন,—'কোথায় ভাগছ! আমার বাবার গৎ শোন, তোমার প্রপিতামহ।') দাদাকে (আফতাবউদ্দীন) শেখাবার জন্য বাবা দুই ওস্তাদ রেখেছিলেন—রামকানাই শীল, রামধন শীল। রামকানাই তবলা বাজায়, রামধন বেহালা। ও অঞ্চলে তাঁরাই তখন প্রধান ওস্তাদ। আমি দাদার বাজনা শুনি আর সকালে ইস্কুল যাবার নাম করে সাধুদের আড্ডায় যাই: একদিন হেড মাষ্টার আমাদের বাড়ি এসে নালিশ করলেন. "তোমার ছেলে ও ইস্কুল যায় না।" মা—"কেন? রোজ পাঠাই।" "তবে আর কোথাও যায়। দেখ খোঁজ নিয়ে।" বাবা তাই শুনে, গিয়ে দেখেন—সাধু সেতার বাজাচ্ছে, আমি ঠেকা দিচ্ছি। দাদার শুনে যা শিখেছি। বাবা ফিরে এসে বল্লেন, "শিববাড়িতে ঠেকা দিচ্ছে, এক মহাত্মা সাধুর সঙ্গে। ও'কে তুমি মের না।" মা—"যেমন বাবা, তেমনি ছেলে।" মা ধরে এনে তিন দিন হাত পা বেঁধে রাখলেন, খেতে দিলেন না আর খুব মারলেন। তিনদিনের দিন, আমার বড় দিদি, তাঁর হাতেই আমি মানুষ—মধুমালতী, তাঁর শ্বশুর বাড়ি ঐ গ্রামেই—এসে আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। তারপর বাড়ি ফিরে এসেছি। মার অসুখ। আস্তে আস্তে মার আঁচলের চাবি নিয়ে বাক্স খুলে এক মুঠ যা পেলাম

১০।১২ টাকা তুলে নিলাম একটুও যাতে শব্দ না হয়। আস্তে আস্তে বাক্স বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে মার আঁচলে চাবি বেঁধে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়েই ভাগলাম, সেই রাত্রেই মানিকনগর স্টেশনে—ডাকাতের বংশের ছেলে ত! নারায়ণগঞ্জ হয়ে এলাম শিয়ালদহ। চারদিকের গাড়িঘোড়া, আলো, বাড়িঘর দেখে ঘাবড়ে গেলাম। গ্রামের ছেলে, হাতে একটা বোচকা আর আটটা টাকা। হ্যারিসন রোড ধরে চলেছি গঙ্গার পুলের দিকে। কলকাতায় তখন রাস্তার মাঝখানে ইট পাতা থাকত। সেই সব দেখতে দেখতে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে বসছি, মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছি—আর বাড়িঘর দেখছি। ছেলেরা সব ইস্কুলে যাচ্ছে, আর আমায় দেখে একবার একান একবার ওকান টেনে পালাচ্ছে, ভাবছে—এ আবার কোন ভূত! হ্যাঁ, সত্যি কথা, আসে আর কান টেনে পালায় কলকাতার ছেলেরা। এইভাবে গঙ্গার ধারে আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। খুব খিদে পেয়েছে—গঙ্গার ধারে তখন উড়িয়াদের করা চমৎকার ডালপুরী পাওয়া যেত—খুব ভাল খেতে। তাই দু' পয়সার কিনে খেলাম। জল খাব। তখন ত আর জলের কলটল জানি না। গেলাম গঙ্গায়—লোনা জল। ভাবলাম, 'আহাহা, কী জল খায় এ দেশের লোক?' রাত্তিরে চানের বাঁধন ঘাটে বোঁচকা মাথায় শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখি বোঁচকা নেই। দুঃখে কাঁদতে লাগলাম। এক সিপাহী ছিল—পুলিস, এসে বল্ল, "ক্যায়া হুয়া।" "সিপাহীজী আমার বোঁচকা চুরি গেছে।" "আরে তুমি বোকা ছেলে। ওরকমভাবে কেউ বোঁচকা রাখে। কত টাকা ছিল?" "আট টাকা।" কাঁদতে কাঁদতে নিমতলাঘাটে এলাম। সেখানে সাধু বসে আছে অনেক—এই বড় বড় জটা। এক মহাত্মা বসে আছেন ধুনী জ্বেলে,—তাঁর চার পাশে অন্য সাধুরা। খুব গাঁজা চলছে। গিয়ে কেঁদে পড়লাম। সাধু বল্লেন, "কুছ পরোয়া নহি, গঙ্গা নাহাও।" গঙ্গা নেয়ে এলাম। সাধু ভস্ম দিলেন। খেলাম। বল্লেন, "সিধা যাও।" সিধা গেলাম, এক কাঙালী ভোজনের জায়গায়। যত খোঁড়া, নুলো, অন্ধ, কানা জুটেছে। তাদের ভাত, শাক, ডাল দিচ্ছে এক ব্রাহ্মণ পরিবেশক। আমায় দাঁড়াতে দেখে

ব্রাহ্মণ বল্ল, "কী খোকা! খাবে?" খুব খেলাম—মোটা ভাত, ডাল, শাক। "যাও এবার জল খাও।" "কোথায় যাব! সেই গঙ্গায়?" "গঙ্গা কেন? ঐ কল রয়েছে।" সেই শিখলুম জলের কল। সামনেই কেদারনাথ ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারী—ভাল বারান্দা, সেইখানেই ঘুমালাম। রোজ একবেলা গঙ্গাজল খাই সাধু বলে দিয়েছেন আরেক বেলা লঙ্গরখানায়, আর ঐ কেদার-ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারীর বারান্দায় শুই। একদিন জিজ্ঞেস করলেন কেদার ডাক্তার "এই ছোক্‌রা, কে তুমি?" "আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। ত্রিপুরায় বাড়ি। গান বাজনা শিখতে চাই।" "কী গানবাজনা? দুষ্টু ছেলে? চুরিটুরি করবে না ত?" "আজ্ঞে, কোন ওস্তাদ আপনার জানা থাকলে যদি দেখিয়ে দেন।" 'ওস্তাদ? জুতা মারব? বেরও।" "আজ্ঞে, দয়া করে আমায় তাড়িয়ে দেবেন না। আমি এখানেই শুয়ে থাকব। আপনি যাবার সময়ে ঘরে তালা দিয়ে যাবেন।" থাকি সেখানে। ছোট ছোট ছেলেরা ওষুধ কিনতে আসে, জিজ্ঞেস করে, "খোকা তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?" "ত্রিপুরা থেকে এসেছি, গানবাজনা শিখতে চাই। এক ওস্তাদ দেখাবে?" কেউ শোনে, কেউ শোনে না। কেউ কেউ দু' এক পয়সা দিয়ে যায়। একবেলা গঙ্গা জল খাই—সাধু বলে দিয়েছেন,—আরেক বেলা লঙ্গরখানা। এর মধ্যে একটি ছেলে একদিন শুনে বল্ল, "আমি শিখি এক ওস্তাদের কাছে। তোমায় নিয়ে যাব।" "গেলাম লুলু গোপালের কাছে। বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া, খেয়ালও গান। যতীন্দ্রমোহনের কোর্টের গাইয়ে। লুলু গোস্বামী বল্লেন, "১২ বছর স্বর সাধনা করতে হবে।" "জীবন পর্যন্ত শিক্ষা করব।" বেশি কথা বলতে পারি না—চারপাশের ঐশ্বর্য বিছানা-পত্তর কাপড়চোপড় দেখে ঘাবড়ে যাই। সাধু বলেছে গঙ্গাজল খেতে—তাই খাই একবেলা, আরেক বেলা লঙ্গরখানায় ভাত। স্বর সাধি—একহাতে তানপুরা, আরেক হাতে বাঁয়া ধরি, একপায়ে মাত্রা গুণি, আরেক পায়ে তাল। এই হল গুরুর মূলমন্ত্র—শিষ্যদেরও তাই শেখাই—নাতিকেও শেখাই। ৩৬০ রকম পালটা করালেন গুরু। তার সঙ্গে তাল। তাতে এমন পাকা হলুম, যা শুনি, তাই ধরে ফেলি।

সুর সাধনা খুবই দরকার—সরগমই ত অক্ষর। এরা ত কেউ করে না। কিছুদিন শিখলাম। তারপর তিনি মারা গেলেন প্লেগে। হতাশ লাগল—আর ত শিখতে পারব না। বিবেকানন্দের ভাই হাবু দত্ত। সিমলায় থাকেন। বিবেকানন্দের ঘরের সবাই ওস্তাদ। বিবেকানন্দ ভাল ধ্রুপদ গাইতেন। হাবু দত্ত ক্ল্যারিওনেট, সেতার, অনেক ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট বাজাতেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের কনসার্ট তৈরী করতেন। গেলাম তাঁর কাছে। "কী শিখবে, গান শিখবে?" "আজ্ঞে না যন্ত্র শিখব। বেহালা।" ইংরেজী ব্যাণ্ড, শানাই শুনে বড় ভাল লাগত। শিখতে লাগলাম। হাবু দত্তের তৈরী কনসার্টের সুর—ইমন। একেকদিন চার পাঁচটা গৎ শিখি। এক মাসে ও'র খাতা শেষ করে দিলাম। নন্দবাবু লুলুবাবুর সঙ্গে মৃদঙ্গ, তব্‌লা বাজাতেন। তাঁর কাছে তব্‌লা, মৃদঙ্গ শিখি। হাবুবাবু বল্লেন, "ঠিক আছে, সব যন্ত্র শেখাব।" চাকরিও ঠিক করে দিলেন মিনার্ভায়। ১ টাকা মাইনে। গিরিশ ঘোষ প্রোপাইটার। সরাব্‌ খেয়ে এই মস্ত্‌ হয়ে আস্‌তেন। দানীবাবু, চুনীবাবু, এ'রা সব ছিলেন। নৃপেন বসু নাচ শেখান। সে সব কী বাজনা! কী গান! মর্জিনার গান—"বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দেব না," "লেও সাকী দাও ভর প্যালা"—এই ত গান। ওরা মনে করে এমন গুণী আর নেই। একদিন তবলা বাজাচ্ছি। গিরিশ ঘোষ বল্লেন—"নেড়েটাত বেশ বাজায়। এই চুনী, নিকেল—দেখ। এই নেড়ে, তুই কি আমাদের কাছেও নেড়ে থাকবি।" আমার ভয়, সরাব্‌টরাব্‌ খেয়ে কী করেন! পিঠে থাবড়া দিয়ে বল্লেন—"তোর নাম হল প্রসন্ন বিশ্বাস।" বেতন পেলেও কাঙালী ভোজন ছাড়িনি। লোবো সাহেবের কাছে যাই ভায়োলিন শিখতে। সাহেব বলে—"নিগারকে শেখাব? যাও। গেট্ আউট্।" মেম সাহেবটি ভাল ছিলেন। তাকে বলে সব হল। ইংরিজী মাত্রা, নোটেশন শিখলাম। (একটা দম দিই, দাঁড়াও, চাঙা হয়ে নিই)। লোবো সাহেব আসলে গোয়ানীজ। ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ড মাস্টার। তাঁর শিষ্যের কাছে কর্নেটও শিখছি। হাবু দত্ত ক্ল্যারিওনেট শিখান। মেছোবাজারের হাজারী

এনেছেন। আমি ত সে সুযোগ পাইনি।) একদিন আবেদ আলীর মা ডেকে বল্লেন, "দেখ বাবা এক ডাক্তারের কাছে যদি অসুখ না সারে, তখন লোকে আরেক ডাক্তারের কাছে যায়। আমার ছেলের কাছে যা শিখেছ, শিখেছ। এবার আরেক জনের কাছে যাও।" আমি ভাবি আমায় বুঝি তাড়িয়ে দেবেন। কেঁদে পড়ি। "কোথায় যাব। কার কাছে যাব?" "উজীর খাঁ সাহেব আছেন। তাঁর কাছে যাও।" যাই উজীর খাঁর কাছে। যাই, দেখাই হয় না। দরওয়ান বলে, "নেই হোগা, কার্ড আছে?" ৬ মাস গেল এইভাবে। থিয়েটরের ৬।৭ টাকা মাত্র তখনও ছিল। ভাবলাম আমার মত গরীব লোক কি আর শিখতে পারবে? কিন্তু বাঙলা দেশে মুখ দেখাব কী করে, যদি মানুষ না হলুম? ঠিক করলাম জীবন দেব। দু'তোলা আফিম কিনলাম সেদিন ভোরে নামাজ পড়ছি। মনটা উদাস। এক মৌলভী জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মন কেন এমন উদাস?" মসজিদে মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। তাই স্বীকার করলাম, "আফিম কিনেছি প্রাণ দেব। বাজনা শিখতে পেলুম না, কী হবে জীবন রেখে।" "আরে, আরে বাজনা শিখবে। অন্য ওস্তাদের কাছে যাও।" "কেউ শেখায় না।" "আরে তুমি জাহের আদমি আছ। শোন—'হিম্মতে মর্দা, মদতে খুদা—' চেষ্টা কর। চেষ্টা করলে খুদাকেও পাওয়া যায়।" মৌলভী একটা আর্জী লিখে দিলেন—"আমার নিবাস ত্রিপুরা। আমি সরোদ শিখিতে এতদূর আসিয়াছি। আমি আফিম খাইয়া প্রাণ দিব।' উজীর খাঁ কবিও ছিলেন। তাঁর নাটক ছিল 'ভর্তৃহরি'। নবাব যাচ্ছেন সেই থিয়েটর দেখতে। মোটরে। আমি ছুটে গিয়ে দু'হাত মেলে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়ালাম। সিপাই সান্ত্রীতে আমায় নিয়ে টানাটানি। দেখায়, আমরা কেমন কাজের, বুঝতে পারি। নবাব বলেন, "কী ব্যাপার? কী চাও?" আর্জী এগিয়ে দিলুম। নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী পড়লেন— "আপনার দরবারের উজীর খাঁ, তাঁর কাছে বাজনা শিখিতে চাহি। তাহা না হইলে আমি আফিম খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।"

শুনেটুনে নবাব বল্লেন, "কোথায় আফিম, দাও দেখি।" আফিমের গুলি দুটো নিয়ে নবাব লোফালুফি করতে করতে বল্লেন—"তুমি ত বড় জাহের আদমি আছ। চল, থিয়েটার দেখবে না? আমার সঙ্গে এস।" হামিদ মন্‌জিল নবাবের প্রাসাদ। নবাব জিজ্ঞেস করলেন, "কী যন্ত্র বাজাও, আন।" যন্ত্র আনলাম, সরোদ, বেহালা। রামপুর দরবারে সাতশত গাইয়ে বাজিয়ে। বড় বড় তবলচি। একটু আলাপ করলাম—সেই চুরি-করা আলাপ। নবাব বল্লেন, "তুমি ত সরোদ শিখেছ, আর কী শিখবে?"

"বীণা।"

"বীণা ত এরা ছেলেকে ছাড়া আর কাউকে শেখায় না। আমি অবশ্য শিখেছি।"

"আপনি নিজে শেখান।"

"আমার গানের সঙ্গে সঙ্গৎ করতে পারবে?"

"হাঁ পারব।"

বেহালা তখন ভাল বাজাই, ধরলাম। শুনে নবাব খুসি—"চাকরী কর আমার দরবারে।"

"আজ্ঞে না, চাকরী করব না, বিদ্যা শিখব।"

গান গেয়েছিলেন একটা বেহাগের হোরি "যমুনা জল, সখি, ক্যয়সে যায়ুঁ।" বাজাব কি গান শুনে মুগ্ধ। বলি "হুঁজুর, আরেকটা গান।"

"ক্যয়া, হুকুম কর রাহা হ্যায়! আচ্ছা তুমি ত হারিয়ে দিলে আমাকে ঠিক ঠিক বাজিয়ে। এবার বাজাও ত টপ্পা।" এটা বাজাতে পারলাম না।

নবাব হেসে বল্লেন, "এই মরা মরা।"

"হুঁজুর আমি ত মরাই। এসব শেখান।" নবাবের কথায় তখন প্রাইভেট সেক্রেটারী খাঁ সাহেবকে নিয়ে এলেন। নবাব উজীর খাঁকে বল্লেন, "খাঁ সাহেব, এই বাঙালী জাত; জঞ্জালের জাত। এ দেখুন এসেছে, ত্রিপুরা থেকে। ছ'মাস আপনার বাড়ির দরজা থেকে ফিরে এসেছে। আজ বলছে প্রাণ

দেব। আপনি একে শেখান। কাশেম আলির শিষ্য এর বাবা।" তক্ষুনি নাড়া বাঁধার পালা হল। বড় বড় থালা মিঠাই এল। সাদা পাগ্‌ড়ি এল। গুরুদেব প্রথম নবাবকে নাড়া বাঁধলেন (প্রথম শিষ্যকে আবার বাঁধতে হয়, নতুন শিষ্যগ্রহণের সময়), তারপর আমাকে। সত্য করলাম—"আমার বিদ্যা কুপাত্রে দেব না। কুসঙ্গে যাব না। বিদ্যা ভাঙ্গিয়ে ভিক্ষা করব না। বাঈজী-বেশ্যাকে গান শেখাব না।" চরিদিকে রটে গেল এক বাঙালী নবাব বাহাদুরের গাড়ি আটকেছে। পুলিস ডিটেক্‌টিভ আমি বাঙালী, বোমা মারি কি না খোঁজ নিল। নবাব তাই জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বোম মার না ত?"

"আজ্ঞে না, তবে যদি শেখান তবে সুরের বোমা মারতে পারি।"

রয়ে গেলাম গুরুর সঙ্গে। সারাদিন গুরুর জুতা, হুঁকো, পানদান, মেডেল পরিষ্কার করি। খুব সন্তুষ্ট হতেন। দিনের বেলা রেওয়াজ করবার সময় পেতাম না। রাত্রে ৪টার সময় বসতাম রেওয়াজ করতে। ভোর ৪টায় উঠতাম। সকালে নামাজ করে এসে মাটির হাঁড়িতে গোবর মাখিয়ে একটু চা খাওয়া হয়, বাসি রুটি লবণ দিয়ে খাই। একদিন চা-টা খেয়েদেয়ে ভৈরবী বাজাচ্ছি—ভৈরবী বড় ভালবাসি আমি। দেখি এক কাবুলী এসে হাজির—এই পর্যন্ত দাড়ি। "আমি আসতে পারি?" আমি বাজিয়ে চল্লাম। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বাজনার পর চোখ খুললেম। "অনেকদিন থেকেই ঘুরছি এখানে। তোমার বাজনা শুনি। চা খাওয়াতে পারবে?" চা তৈরী করলাম। তিনি তখন ঝোলার থেকে একটা কালো কটোরা বের করলেন। আগুনে দিয়ে কী টিপ দিলেন, সেটা সোনা হয়ে গেল। "তুমি এটা ভাঙ্গিয়ে আন। রোজ চা খাওয়াবে।"

"তা এই সোনার কী দরকার। চা আপনি এমনিই রোজ খেয়ে যাবেন।"

"আঃ, যাওত, আমার দরকার আছে।"

রামপুরের সুন্দরলাল আমার কাছে তবলা শিখত। তার কাছেই প্রথমে গেলাম। কী জানি, পুলিসে ধরে যদি। সুন্দরলাল দেখে ত বল্ল, "আরে এ ত আস্‌লি সোনা—কোথা মিলল?"

"এক মহাত্মা ছিলেন। তিন তোলার টাকা দিলাম তাঁকে। রোজ তিনি চায়ের সরঞ্জাম আনতেন। ৭ দিন চা খেতেন, ৮দিনের দিন একটা রুটি। এক মাস ছিলেন। যাবার আগে তমসা নদীর জলে ৭ দিন গলা-জলে নেমে রইলেন। তারপর একাটা মাদুলী তৈরী করে দিলেন আমাকে। আপনারা কি বিশ্বাস করবেন একথা? বল্লেন, "এটা তোমার। রেখে দেবে। খুব উপকার হবে। আমি চলে গেলে শনিবার ধুনো দিয়ে হাতে বাঁধবে।" তাই করলাম। ঘুমের থেকে উঠে দেখলাম দুটা দৈত্যের মত আমার দুপাশে শুয়ে। "সর্বনাশ, এটা কী? স্বপ্ন দেখছি নাকি?" মাদুলিটা খুলে ফেল্লাম। দেখি আর নাই। কী ব্যাপার! আলাউদ্দীনের চেরাগ পাব নাকি? ২য় দিনও তাই—চক্ষু মেলে দেখি আর ভয় পাই। এই বড় বড় লোম, নিজের চোখে দেখেছি। ৩য় দিন ফেলে দিলাম তমসার জলে। গুরুদেবকে বল্লাম। তিনি শুনে বল্লেন, আরে আরে করলে কী? তোমাকে দুজন জামিন দিয়ে গেছল—যা বলতে তাই করত ওরা। তুমি মহা-বেয়াকুব আদমি। আমাকে দিয়ে দিতে!"

গুরুদেব কখনও রামপুর ছেড়ে কোথাও যেতেন না। কাশ্মীরের রাজা একবার এলেন—এই বড় পাগড়ি—এত বড় পাগড়ি কোনও রাজার দেখিনি। বাজনা শুনে বল্লেন, "চলুন, কাশ্মীর দেখে আসবেন।"

তা গুরুজী বল্লেন, "পরে দেখা যাবে।" গুরুজী খুব সম্মানী লোক ছিলেন। দরবারে খুব বড় বিশিষ্ট অতিথি এলে তখনই বাজনা শোনাতে যেতেন। এমনিতে কখনও শোনাতেন না। তাঁর মাইনেই ছিল ৭০০৲ টাকা। এছাড়া ১০০০০৲ টাকা আয়ের জমি। নবাব বাড়ি থেকে তাঁর বাঁক ভর্তি ভর্তি খাবার আসত। ৫০ বাঁক ভর্তি খাবার। পোলাও, কাবাব, বিরয়ানী, কোপ্তা, পান-জর্দা। দেখে মনে

হত খেয়ে ফেলি। মাঝে মাঝে পেতামও। গুরুজী ছিলেন মাংস খাওয়ার যম। বলতেন, "সকালবেলা রুটি দিয়ে মাংস খাও, টান দাও, গলা খুলবে। জন্ম নিলি কেন? মাংসই খেলি না?"

"গুরুদেব, মনে হয় কী কুকুরের মাংস না কী খাচ্ছি?"

"আচ্ছা, আমি রাঁধব—খেয়ে দেখ।"

একদিন শামী কাবাব করলেন। হাতে নিয়ে শুঁকে শুঁকে দেখি—গুরুজী ধমক দিলেন—"এই, শুঁকে দেখছিস কী? খাস ত ব্যাটা মছ্‌লি কী পানী।" ভয়ে ভয়ে খেলাম। একটা খেলাম। বড় ভাল লাগল। বল্লাম, "হুজুর, আরও একটা দেন।" এইভাবে আট দশটা খেয়ে ফেল্লাম।

চুপসা মিঞার কবরের কাছে একটা বাড়িতে আমি থাকি। একটা গেট আছে, অপর সাইডে গুরুর বাড়ি, আরেক সাইডে দর্গা। নবাব বলে দিয়েছেন, "গুরুদেবের রোজ সেবা করবে। টাকা-পয়সায় এ বিদ্যা পাওয়া যায় না। জান ত?" সকালবেলা গেলাম। ৮টার সময় গুরুদেব ওঠেন। পায়খানায় বদনায় জল দিলাম, ফিনাইল দিয়ে ধুলাম। রোজ এই কাজ করি। আর যন্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এইভাবে কাটল ২॥ বৎসর। এক ঘণ্টাও কেউ সহ্য করতে পারত না। রামপুরের একটা ব্যাণ্ড প্যার্টি ছিল। অর্কেষ্ট্রা। ১০০ যন্ত্রীর অর্কেষ্ট্রা। মহম্মদ হুসেন খাঁ—এই মাস্তাক হুসেন খাঁর গুরুর ভাই, আর এনায়েৎ খাঁর ভাই—তিনি ছিলেন সেই অর্কেষ্ট্রার বাজিয়ে। তিনির কাছে যেতাম। তা তিনি একদিন বল্লেন, "মন্ত্র নাও তুমি, আমার গুরুর কাছে।" বেরিলীতে তাঁর সঙ্গে গেলাম সাধুর কাছে। গুরু হাত ধরে বল্লেন, "আরে মহম্মদ হুসেন, এর ত সঙ্গীতের দিকে মন। সেদিকেই এর আধ্যাত্মিক সাধনা। এদিকে নাইরে তার মন। একে আমার কাছে এনেছ কেন? মহম্মদ হুসেনেরও সাকরেদ হলাম। তিনি ছিলেন বীণকার। ১২টার সময় গুরুর কাছ থেকে তাঁর কাছে যেতুম। খাওয়ার নাই। ছোলা জল খেতাম, পেট ভরে যেত। এখনও খাই ছোলা। খুব উপকারী জিনিস। আর মটরবালী। আর এক ব্যাণ্ড-মাষ্টার ছিল রাজা হোসেন খাঁ!

লক্ষ্মৌর দৌলৎ খাঁর ছেলে—ধ্রুপদ হোরি গাইতেন। তিনি আমার বাজনা শুনে খুব তারিফ করলেন। সেখানে বাজিয়ে ছিলেন মুস্তাফা হুসেনের শ্বশুর নিশার হুসেনের ঠাকুর্দা হায়দার হুসেন খাঁ আর ফায়দা হুসেন খাঁ। বেহালা শুনে তাঁরা বল্লেন, "আরে ·এখানে চলে এস।" রাজা হুসেন খাঁ ধ্রুপদ হোরি গান, ব্যাণ্ড জানেন না। আমি হবু দত্তের ব্যাণ্ড জানি। রাজা হুসেন ব্যাণ্ডের গৎ তৈরী করেন, সেগুলো ভেঙে চুরে আমি টিউন ঠিক করে দিই। রাজা হুসেন বলেন, "বাপু, তোমাকে অনেক ধ্রুপদ দিব, তুমি ব্যাণ্ড কর।" আমার গুরু তখনও শিখাচ্ছেন না। দরবারে একদল গাইয়ে থাকে তাদের বলে নক্কাল। বড় বড় গাইয়ে যেই গেয়ে গেল, নবাবের হুকুমে, তক্ষুনি তারা অবিকল সেই রকম করে গেয়ে যাবে। রাজা বলতেন, 'নকল কর' অমনি হীরালাল নক্কাল এসে ঠিক ফৈয়জ খাঁর মত করে গেয়ে যেত। হাসিয়ে মারবে। ঐ ছিল ওদের চাকুরি। দাড়িওয়ালা বাহাদুর, আলি আফাতুল—এরা ছিল সব নক্কাল। এদের কাছেও অনেক পেয়েছি।

একটা আমার লজ্জার কথা বলি—মা ভগ্নী নাতিরা সব আছেন, ত্যক্ত হবেন না। আমার বাড়ি গাঁয়ে। গৃহস্থলোক। বাড়িতে তিন বউ। তাঁরা যখন বাইরে যান, দুটো বদমায়েশ লোক পিছনে লাগে। বড় বৌদি খুব সাহসী। তিনি একদিন বল্লেন লোকটাকে, "আমরা গৃহস্থ বউ, আমাদের পেছনে লেগেছ, লজ্জা করে না?" দাদাকেও জানালেন সেকথা। পঞ্চায়েৎ বসল হিন্দু-মুসলমান মিলে লোকটাকে দণ্ড দিল। আমার স্ত্রী সেইদিনই ফাঁসি দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর মনে হল "আমার উপর কুদৃষ্টি দিয়েছে। কোনদিন ধরে নিয়ে যাবে। আমার কলঙ্ক হবে।" তিনবার ফাঁসি যাবার চেষ্টা করেছিলেন। এ আমার স্ত্রীর কথা শুধু নয়—বঙ্গললনাদের কথা, সতীত্ব। আমার গুরুর কাছে তার এল। বেয়াদবীর কথা বল্লাম মনে কিছু করবেন না। গুরুদেব ত তার পেয়ে অবাক—"আরে আরে বাবু আছে কোথায়—পিয়ারা মিঞা, মজলা সাহাব, ছোটা সাহাব বাবু কোথায়।" বাঙালীকে ওরা বাবু বলে। গুরুর ছেলেরা বলেন, "হুজুর, সেত রোজই ১২টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে," "তোমরা তাকে

শিখালে না কেন?" "আপনার অনুমতি নেই, কেমন করে শেখাই।" "ডাক তাকে।" ডাক শুনে তাড়াতাড়ি গেলাম। বল্লেন, "আমি কে?" "খোদা।" "আরে আরে ওস্তাদ বল। কে কে আছে তোমার?" "বাবা মা ভাই দাদারা, দিদিরা।" "বিয়ে করেছ?" মাথা নত করে রই। "কেন বিয়ে করলে?" "বাবা মা দিয়ে দিলেন।" "কবে?" "মনে নেই, আমার তখন বছর ৭ বয়স।" গুরু শুনে হাসতেও পারেন না।—"এত ছোট বয়সে তোমাদের বিয়ে হয়?" "বাবা আর শ্বশুরের বন্ধুত্ব ছিল, তাই।" একথার পর ডাকলেন তাঁর ছেলেদের (নসীর খাঁ, নজীর খাঁ, সগীর খাঁ—নসীর খাঁর ছেলে হচ্ছেন দবীর খাঁ)। তাদের বল্লেন, "পিয়ারা মিঞা, মজ্‌লা সাহাব, ছোটা সাহাব আজ থেকে আল্লাউদ্দীন তোমাদের ভাই হল। তোমাদের যা তালিম দিয়েছি, সব তোমরা একে দাও। আমিও শিখাব।" এই শুরু হল আমার শিক্ষার, আমার স্ত্রীর ফাঁসীর খবর পেয়ে।

আমাদের ব্যাণ্ড মাস্টারও গুরুজীর শিষ্য। তিনি এসে বল্লেন, "হুজুর, আমি ত এক প্রার্থনা চাই। এই বাবুকে দিন। আমাদের ব্যাণ্ডে বাজাবে। ও অনেক মদৎ করে।" শুনলেন। দিলেন। ব্যাণ্ড পার্টিতে এক ঘণ্টা বেহালা বাজাতাম, পেতাম ১২ টাকা, সেই কলকাতার ১২ টাকা। চানা খাওয়া তখন শেষ হল, গুরুর কাছেই খেতাম। আমার গুরুমাতা তিনিও খুব ভাল সেতার বাজাতেন। তাঁর গৎ একটা শুনাই। রাত্তিরে যখন বাজাতেন, শুনতাম—পিছে থেকে গুরু বলতেন, "তোমার মা বাজাচ্ছেন। মা, তোমার গৎ একে শিখিয়ে দাও।" গুরুমাতা মহরমে মূর্ছিয়া গাইতেন—কাঁদিয়ে দিতেন। গুরুজী বাজাতেন সারারাত, ১২টার পর। তারপর ঘুম ৮টা পর্যন্ত। সে কী বাজনা, মনে হত "ভগবান আ গয়া।" গুরুজী ধ্রুপদ গাইতেন ভাল। খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। শ্যামবর্ণ। আমার কাছে ছবি আছে। ৪০।৫০ বছরের। মারা গেছেন, তখন বয়স ৬৫। ৩০ বছর শিক্ষার পর গুরুজী আদেশ দিলেন "দেশভ্রমণ কর, শিক্ষা, দীক্ষা; পরীক্ষা—এই তিনেই বিদ্যা। গুণীদের বাজনা শোন আর শোনাও। বেরলাম। ঘুরতে ঘুরতে এলাম কলকাতা।

সেখানে ছিলেন গণপৎ রাওয়ের শিষ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রী। ভবানীপুরের এক সংগীত সম্মেলনে নিমন্ত্রণ পেলাম। আমি আছি পুটিয়ার রাণীর বাড়ি। ঐ তো হেতুয়ার কাছে। বীণকার লছমীপ্রসাদ, কেরামৎ উল্লা, না না মিথ্যাকথা বলব না। এমদাদ খাঁ ছিলেন, বিশ্বনাথ রাও, ধামার গাইয়ে দানীবাবু, রাধিকা গোঁসাই। আমার সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজাবেন দর্শনসিং, তাঁর ড্রেসের ক, বাহার—গিলে করা পাঞ্জাবী। আমারও তেমনি। তখন ফৌজী কোর্ট দেখেছি নতুন। খুব সখ তাই পরি। সেই একটা পরে, দাড়িও আছে, রামপুরী পায়জামা। ধুতি কোথায়? গরীব অবস্থা। গেলাম সম্মেলনে। কিন্তু কেউ আমায় ডাকেই না। এর কাছে যাই, ওর কাছে যাই, কেউ পাত্তা দেয় না। আমার বাজনার সময় এল—কালীবাবুকে ডাকি, তিনি তখন পান চিবিয়ে তাস খেলতেই ব্যস্ত, শেষকালে এলেন। মণীন্দ্র নন্দী এসেছেন। এত দেরী। সবাই তটস্থ। দেরী কেন? কালীবাবু বল্লেন—"আল্লাউদ্দীনের দোষ নেই। দেরী আমার জন্যই হয়েছে। খাঁ সাহেব তৈরি ভোর থেকে।" প্রথমে কেউ ভাল করে দেখেই না আমাকে। ঐ সাজ, ভাবে কোথাকার জংলী এসেছে। তারপর তানপুরা বেঁধে যখন একটা তান মারলুম সব বল্লে, "আরে গুণ আছে ত?" সবাই শুনতে আরম্ভ করল। প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্বিত আলাপ। তখন গুরুদেবের স্মৃতি মাথায় রয়েছে। কারোর হাতে পান, কারোর হাতে সিগারেট থমকে আছে—মুখে আর দেওয়া হয় না। দেশলাই জেলে সিগারেট ধরাতে গেছে—আগুন নিভেই গেল, ধরান হল না। তিন ঘণ্টা হয়ে গেল। দর্শন সিং তবলচি এসেছিল বাজাতে। কালীবাবু বল্লেন, "এ হল তবলচির যম। বসিয়ে দাও আরও কয়েকজন তবলচি।" দর্শন সিংয়ের দম আধা ঘণ্টায়ই বেরিয়ে গেল। অন্য তবলচি এল। চার ঘণ্টা বাজালুম। লছমীপ্রসাদ বীণকার শুনে বল্লেন, "এত বীণকারের তালিম। আল্লাউদ্দীন তুমি বেঁচে থাক, এই বিদ্যা এদেশে প্রচার কর।" "তা হয় না। আমি শিক্ষা করি। আমার সাধনা এখনও বাকি। গুরুদেবের আদেশ দেশভ্রমণের, শেখাবার আদেশ নেই।" শ্যামলাল ক্ষেত্রী লেগে রইল।

পিছনে। বল্লে, "মাইহার একটা ছোট স্টেট। তবুও রাজার খুব সখ গান বাজনা শেখার। তুমি যাও। পূজো আসছে, এই সময়েই যাও। রাজা আমার বন্ধু।" রাজি হলাম। শ্যামলাল রাজাকে তার করে দিলে "ছেড়না একে।" এলুম মাইহার। গেষ্ট হাউসে জায়গা হল। খুব খাতির করলে। সপ্তমীর দিন ডাক পড়ল রাজার কাছে। নকীব এসে বল্লে—"ইয়াদ্ ফরমাতা—রাজাবাহাদুরের দরবার ইয়াদ কিয়া হ্যায়।"

৪০।৫০ জন সর্দার তলোয়'র নিয়ে রয়েছে ঘরে। যন্ত্র বাঁধছি—কেউ নেই তানপুরা ছাড়ে। মথুরার ঘোরূরে মহারাজা ছিলেন, তিনি চন্দনচৌবের শিষ্য। ঘোরূরে মহারাজ তানপুরা ধরে বল্লেন, "আমি দিচ্ছি সুর।" মহারাজ এলেন। সব খাড়া হয়ে দাঁড়াল। নকীব—নজর দৌলত ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু বল্ল। আমি উঠে পাঁচ টাকা নজর দিলুম। আট আনার মোহর দিলুম। রাজা বল্লেন, "আপ আচ্ছা হয়, আপ্‌কো তকৃলিফ নেই হুয়া ?" "নেহি সরকার।" "আমার ষ্টেট ছোট। আমার বড্ড সখ সংগীতে। এইত এক বছর হল গদী পেয়েছি। আপনি আমার গুরু হন।" আমি চুপ করে থাকি। আমি ত শিষ্য; আমি কী করে গুরু হই। রাজার পণ যে লোক সবরকম বাজনা এবং গান জানবে তাকেই গুরু করবেন। যাই হোক, রাজা বল্লেন কিছু বাজাতে। ধরলুম শ্রীরাগ। তখন বিকেল ৫টা। যেই আরম্ভ করেছি—দেখি রাজা এদিক চায় ওদিক চায় শেষে ৫ মিনিট পর বল্লেন "আরাম কি জিয়ে।" আরাম করব কিরে বাবা, শুয়ে থাকব নাকি! ফিরে গেলাম। ভাবলাম এ কোন মূর্খের কাছে এলাম। মনটাত খারাপ হয়ে গেল। নামাজের সময় ভগবানকে প্রশ্ন করলাম—এ কোন্ পশুর কাছে পাঠালে। আবার আটটার সময় ডাক পড়ল। একেবারে এক্ষুনি আসুন। গিয়ে দেখি একটা বড় কামরা। যন্ত্র ভর্তি, নানারকম যন্ত্র, বাঁশি, শানাই, এস্রাজ, সেতার, সরোদ্, বেহালা, মৃদঙ্গ, তবলা আরও কত রকম। মহারাজ নেই। ঘোরূরে মহারাজ আছেন। তিনিই বল্লেন, "আপনি প্রত্যেক যন্ত্র একটু একটু বাজান। রাজার পণ যে সব যন্ত্র বাজাতে পারবে,

তাকেই গুরু করবেন।" রাজা আছেন দূরে, তিনি টেলিফোনেই সব শুনবেন, তাঁর যা বলবার টেলিফোনেই বলবেন। বাজালুম। কী আর বাজাব, আগের ঘটনার পর মনটা খারাপ, ধরলুম লেও প্যালা ভর সাকীয়া'—সেই থিয়েটারের গান। তারপর ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল—একটু বাজাই বলে 'বন্ধ করো'। ব্লড হর্ন এনে দিল—বাজালুম পঁ পঁ পঁ ভঁ—আর সঙ্গে সঙ্গেই 'বন্ধ করো।' Bassএ একবার ফুঁক দিই, রাজা বলে 'বন্ধ করো'। যাই বাজাই—সাগাপাসা সাগারেসা—লালালা টুক টালা—রাজা বলে 'বন্ধ করো'। ৫০ রকম যন্ত্র বাজালুম। 'ড্রাম ভি বাজাইয়ে', বাজালেই বলে 'বন্ধ করো'। ঢোল বাজাও—'ঢিক্কা থিৎতা'—'ব্যস্, বন্ধ করো'। চামড়ার যন্ত্র শেষ হল ত এল এস্রাজ,—'তা-আ-আ'···করে তান দিয়ে ধরতেই বলে 'বন্ধ করো'। দু ঘণ্টা কেটে গেল। পরীক্ষা হল আমার, বড় জবর পরীক্ষা। তারপর এল বেহালা। সেতারটেতারও ভাল ছিল, কিন্তু রাজা বল্লেন—"ও সব হয়ে গেছে। পণ পুরণ হয়ে গেছে। একটা গান শোনান।" গান হল। তখন বল্লেন, "ভায়োলিন?" বেহালা শোনালাম। তখন বল্লেন, "আসুন আমার কাছে।" সব টেলিফোনে হচ্ছে, কথাবার্তা। শুনে ভাবছি এবার আবার কী পরীক্ষা করবে রে বাবা! সন্ধিপ্রকাশ শ্রীরাগ আমার গর্ব, আনন্দের জিনিস—সেই যখন ৫ মিনিট শুনেই বন্ধ করে দেয়, তখন ঐ পশুর কাছে যাব কি? তবুও গেলাম। ঘণ্টাখানেক শুনলেন মন দিয়ে। তারপর বল্লেন, "আপনি রাগ করেননি ত?" "কেন, মহারাজ, একথা কেন? আপনার ওপর কি রাগ করতে পারি?" "তখন কী রাগ বাজিয়েছিলেন?" সন্ধিপ্রকাশ শ্রীরাগ। সকালে আর সন্ধ্যায় বাজায়। সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ের সময়ের রাগ। "সে রকম রাগও হয়?" "হ্যাঁ মহারাজ। সব সময়েরই রাগ রাগিণী আছে।" "আপনি যখন বাজাচ্ছিলেন, আমার শরীরে রোমাঞ্চ হল। সহ্য করতে পারলাম না। বন্ধ করতে বল্লাম। কাল দরবার হবে। আপনার আসন সর্দার, আর মন্ত্রীর পর, তৃতীয় স্থান।" আসার সময় জড়োয়া পাগ্‌ড়ি দিলেন।

পরের দিন গেলাম। জংলী লোক পাগড়ি বাঁধতে জানি না। যোরে মহারাজ পাগড়ি বেঁধে দিলেন। সেদিন দরবারে রাজ্যের প্রজারা সব এসেছে ছোট্ট রাজ্য। রাজা সবাইকে বল্লেন, "আজ দশহারা। আমার বহুদিনের ইচ্ছে, সংগীতচর্চা করি, ওস্তাদ রাখি। আজ যা চেয়েছি তার বেশি পেয়েছি। আপনারাও এঁকে গুরু বলে স্বীকার করবেন"। প্রজারা সব হাত তুলে স্বীকার করলে।

কিন্তু আমি তখনও শিষ্য। গুরুর আদেশ আছে কেবল দেশ ভ্রমণের। তাই রাজাকে বল্লুম, "গাণ্ডা বাঁধতে পারব না।" রাজা বল্লেন—"আপনাকেই আমি গুরু বলে স্বীকার করেছি। আপনি এখন যেতে পাবেন না। আপনাকে আমি গুরু না বলে দাদা বলব।" "কিন্তু গুরু ত শুধু দেশ ভ্রমণের আদেশ দিয়েছেন।" "ঠিক আছে। দেওয়ানজী, আপনি এক্ষুনি যান রামপুর।" দেওয়ান গেলেন। গুরুদেব শুনে খুব খুসি। নিজের হাতে গাণ্ডা তৈরী করলেন—মা সরস্বতীর প্রসাদ পাঠালেন। চাকরি নিলাম। আমি নিজের শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট করেছি—তাই আমার পণ এই বিদ্যাদান করে কারও কাছে একটি পান নেব না, পয়সা নেব না। তাই রাজাকে বল্লাম, "আপনি আমার শিষ্য আপনার কাছ থেকেও আমি কিছু নিতে পারি না।"

"সে কী, তবে খাবেন কী?" তখন রাজা তাঁর রাজ্যে যে ভগবানের জমি আছে, দেবত্র, তার ম্যানেজার করে দিলেন। মাইনে ১৫০৲ টাকা। এখনকার ১০০০৲ টাকাও তার কাছে কিছু না। তাছাড়া ভাল বাড়ি। তারপর উদয়শঙ্কর যখন ইউরোপে গেল, আমাকেও নিয়ে গেল। ইউরোপ থেকে এসে নিজে বাড়ি করেছি। ৩৮ বছর আছি মাইহারে। প্রথম যখন রাজা শিষ্যত্ব নিলেন—একদিন জিজ্ঞেস করছেন—"আমি ত বাজনা শিখতে চাই না, আমার গান হবে কি?"

"আপনার আওয়াজটা শুনি, দেখি গলাটা কি রকম?" এবার রাজার পরীক্ষা। গলা শুনে দেখি ভইসের আওয়াজ। বল্লাম, "মহারাজ, সঙ্গীত সাধনা যাঁরা করেন, তাঁদের অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। আমি যা বলব আপনি শুনবেন কি?"

"শুনব।"

"তবে সরাব, ছাড়ুন।"

"তথাস্তু।"

"রাণী ছাড়া আর কারও দিকে কুদৃষ্টি দিতে পারবেন না।"

"তথাস্তু।"

"ব্রহ্মচর্য মানতে হবে।"

"এটাত পারব না, ওস্তাদজী। তবে যতটা পারি করব।"

"যা বলব, সেইভাবে সাধনা করতে হবে।"

"হ্যাঁ করব।"

দেড় বৎসর স্বরসাধনা করালুম। মাংস ছাড়লেন—ফলাহার গ্রহণ করলেন। এখনও এই নিয়মে চলেন। এইভাবে চলে দেড় বৎসরে ভঁইসের মত গলা তারের মত হয়ে গেল। রাণীদেরও শেখাই—মেয়ে হলেও তাঁরা মায়ের জাত, তাই শেখাতে আপত্তি নেই। রাজার আদেশে এক ব্যাণ্ড পার্টিও করলাম। সব অনাথ ছেলেদের ডাক দেওয়া হ'ল। ঢেঁড়া পিটিয়ে ১০০।১৫০ ছেলে জোগাড় করা হল। তারা আমার বাড়িতেই মেস্ করে থাকে। খাওয়াদাওয়া করে। আমার স্ত্রী আসেননি তখনও। আমার তখন সারাদিন কাজ। রাজাকে ৮ ঘণ্টা শেখাই। ৪ ঘণ্টা ব্যাণ্ড পার্টির কাজ। তিমিরবরণ ছিল, তাকে ২।৩ ঘণ্টা শেখাই। রাজা বলেছেন—"আমি যেখানে বের হই যেন গান শুনতে পাই। বেসুর যেন কোথাও না থাকে।"

এই করি আর রেওয়াজ হয় না। আকুল পিয়াসা হল। সংগীতের ক্ষিদে, ভীষণ ক্ষিদে। ভাল লাগে না। রাজাকে বলি, "রেওয়াজ করতে পারি না। ভাল লাগে না। আমার পাগলের মত লাগে।"

রাজা বলেন "আপনি এখানেই খাওয়া দাওয়া করুন. তাতে সময় পাবেন।"

"তা হয় না।"

"আপনি বিয়ে করেন নি?"

"হাঁ, করেছি—কবে মনেও নেই।"

"তবে গুরুমাকে নিয়ে আসুন।"

খবর পাঠালাম। আমার দাদা আফ্‌তাব তাঁকে নিয়ে এলেন।

এক বৎসর হয়ে গেল চাকরির। একদিন বাজারে গেছি, এমন সময় এক কাল লেফাফা এল। গুরুর বড় ছেলে মারা গেছেন। বাজার থেকেই চলে গেলাম রামপুর। গুরুজীর আকুল অবস্থা। আমি যেতেই বল্লেন, "কে? আল্লাউদ্দীন, এস এস। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। সে শাপ আমাকে লেগেছে। আমরে বড় ছেলে, তাকে সব শিখিয়ে তৈরি করেছি। সে সব শেখাত। মারা গেল। শিষ্যের শিক্ষা, পুত্রের শিক্ষা, আর মেয়ের ঘরের শিক্ষা। বড় ছেলের সব শিক্ষা তোমাকে দেব। বীণা শেখ—তিন বছরে সব শেখাব।"

রয়ে গেলাম, এক কাপড়ে এসেছি। রাজার কাছে তার গেল। "৪০ দিন পরে শেখাব" গুরুজী বল্লেন। তাঁর পুত্রের ঘরের সব শেখালেন। "হামার ভগবান" ধামার—এইটে তখন শিখেছিলাম। ধ্রুপদও শিখি তাঁর কাছে। বীণ শেখানর কথায় বল্লাম, "বীণ—মরে যাব, গুরুজী।"

"তবে রবাব শেখ, সুরশৃঙ্গার শেখ।"

তাই শিখলুম। শেখাতে শেখাতে গুরুজী প্রায়ই বলেন, "সব শেখ, আর কাকে এ জিনিস দেব। নাতিরা সব ছোট—তুমি শেখাবে এদের। তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। তোমার কষ্ট দূর হবে।"

তারপর গুরুজী মারা গেলেন।

আমার তিন মেয়ে। এক ছেলে আলি আকবর। মেয়েদের নাম—সরোজিনী, অন্নপূর্ণা, জাহানারা। জাহানারা মারা গেছে। আমার ছেলেকে আমার গুরুর কৃপায় পেয়েছি। গুরুর কাছে ছেলে হয় না বলে ধরে পড়ায়, গুরু (উজীর খাঁ নয় কিন্তু, অন্য গুরু) এক ভস্ম দিয়ে বল্লেন, "বৌকে খাওয়াও।" তারপর তাই করে আলি আকবরকে পেলাম। আমি আরেক ছেলেও চেয়েছিলাম—তা ভগবান দিলেন না। তাও দিলেন—রবিশংকর, অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করেছে।

এ হল আমার নাতি। আলি আকবরের ছেলে। নাম দিয়েছি মহম্মদ আশিস। মুসলমান হয়ত মহম্মদ। হিন্দু হয়ত আশিস্।

আমি বাঁহাতে সরোদ বাজাই। রামপুরে ৪ বছর ডান হাতেই শিখেছি। রামপুর দরবারের অনেকে খুব ঠাট্টা করত আমাকে। "বাঙালী ধুতিখোর, মচ্ছিকে পানি পীনেওয়ালা—রোজ এই চলত। মাস দু এক গেল, চুপচাপ শুনলুম। বেহালা ভাল বাজাই—ওরা জ্বলে। আর ঠাট্টা করে—"মচ্ছিকে পানি পীনেওয়ালা।" ওসব খেলে গান বাজনা হয় না।" ব্যাণ্ড মাস্টার বলতেন, "না না, অমন বল না। বাঙালীর জোড়া মাথা আর নেই। আল্লাউদ্দীন কেমন নোটেশান জানে। তুমি গাও এক মিনিটে শুনিয়ে দেবে।" ওরা শুনে বলে, "কেয়া, নোটেশন মে গানা হোতা। মচ্ছিকে পানি পিয়া হায়?" আমার তখন আর সহ্য হয় না, বল্লাম, "আপকো বাপ্‌কো পিয়া হ্যায়।" ওরা তবুও ছাড়ে না—"মাছ খাও?" "মাছ ত পাই না। ছোলা খেয়ে থাকি। পয়সা কোথায়?" "নোক্‌রী কর। এসব খেয়ে কি সরোদ বাজান যায়, গান গাওয়া যায়?" "তবে কী খাব? হাতীঘোড়া?" "গোস্ত খাও। পোলাও, বিরিয়ানী।" "গোস্ত গোমাংস আমি খাই না।" ও! "হিন্দু নাকি?" এই রকম ঝগড়া রোজই প্রায় হয়। একদিন জামিরুদ্দীন আর আরও কয়েকজন—ফাজিল সব জুটেছে। আমায় নিয়ে খুব ঠাট্টা চলছে। জামিরুদ্দীন ব ছে, "গোস্ত খাও, বাজাও। মচ্ছিকে পানি মে কুছ্‌ নেহি হোগা।" শুনেই মেজাজ চড়ে গেল আমার, "শূয়রের বাচ্চা—কী শুনতে চাও। বাজনা নেহি হোগ? পায়ে ধরে সরোদ বাজাব। শুনবি? মা সরস্বতীর জিনিস, তাই পায়ে ধরব না। বাঁ হাতে বাজিয়ে শোনাব।" জমিরুদ্দীন বলে "হিন্দুর মত কথা বল কেন?" "আমরা ত হিন্দুই ছিলুম।" "কাফের।" কাঁহাতক সহ্য করা যায়। হ্যাঁ শূয়ারের বাচ্চাই বলেছিলাম। সেই থেকে বাঁ হাতে তারের যন্ত্র, ডান হাতে চামড়ার যন্ত্র বাজাই। থাপ্পড়ও বাঁ হাতে মার। বাঙালীর মেজাজ। রাজাকেও মেরেছিলাম। আঙুল মচকে গিয়েছিল রাজার থাপ্পড় খেয়ে। বাঙালীকে শান্ত দেখেন—রেগে গেলে বোমা মারে।

এই ত আমার সব কথা শেষ হল। আপনাদের অনেক কষ্ট দিলুম। ইউরোপের গল্প? সব বলতে হবে নাকি? সে আরেক দিন হবে।

দ্বিতীয় আসর

উদয় তার নাচের দল নিয়ে ইউরোপ যাবে। আমাকেও নিয়ে যেতে চায়। বল্লাম, বাবা, কতদিন থাকবে তোমরা—আমি এক বছরের বেশি বাইরে থাকব না। জানুয়ারী মাসে আমরা ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপ যাত্রা করি। দলে ছিল উদয়শঙ্কর, রবীন্দ্রশঙ্কর, সিম্‌কি জহুরা বেগম, ইহুদী ম্যানেজার গ্রাটা আর আরও আট ন'জন।

ছেলেবেলা থেকে দেশ দেখা আমার নেশা। সংগীত আর দেশ দেখার জন্য বাবামাকে ছেড়ে আট বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়েছি। ৬৭ বছর বয়সে জাহাজে চড়ে মনে হল সেই ছোট ছেলে হয়ে গেছি আবার।

এদিকে ত জানি না কাঁটা ধরতে ছুরি চালাতে। জাহাজে খুব অসুবিধা হল। অল্প বয়স যাদের তারা ত তাড়াতাড়ি শিখেছিলেন। উদয়রা বহুদিন ইউরোপে কাটিয়েছে, তাই তাদেরও কোন অসুবিধে ছিল না। মুশকিল হল আমার। সকলের সঙ্গে খেতে বসতাম কিন্তু কাঁটা চামচ চালাতাম আনাড়ির মত,—কী করে চালাব, আমার পূর্বপুরুষ সরকি চালিয়ে অভ্যস্থ—আর খাবার সময় মুখ একটু বেশি ফাঁক হল, কি একটু শব্দ হল ত সবাই ব্যতিব্যস্ত। অন্য যাত্রীরা, বিশেষ করে যারা ভারতবাসী—তারা আমার ব্যবহারে লজ্জায় আর রাগে রাঙা হত। আমি সে সব কথা ভাবতাম না। নির্বিকারচিত্তে আহারকার্য নিষ্পন্ন করতাম। কত বড় হোটেলে, সাহেব মেমদের বড় বড় পার্টিতে ঐ চালিয়েছি। কি জাহাজে কি প্যারিসে কি ডিভনসায়ারে এল্‌মহার্স্টের বাড়িতে—সব খানেই চার পয়সার নিমের মাজন দিয়ে দাঁত মেজেছি, বাথরুমে সাবান দিয়ে নিজের হাতেই গেঞ্জি কেচেছি। শোবার সময় লুঙ্গিই পরেছি, খাবার জন্য আলাদা সুট করিনি এক সাধারণ সুটেই সব কাজ সেরেছি। তারজন্য কেউ অনাদর, তাচ্ছিল্য করেনি। গানবাজনার সময় দলের সকলেই ধুতি পাঞ্জাবী পরতাম।

ইউরোপের খাবার দাবার আমার একটুও ভাল লাগেনি। ওদেশে জল খাওয়া যায় না—খালি মদ খাও। মাছ মাংস তরকারীতে না আছে হলুদ না আছে লঙ্কা, খালি সিদ্ধ। আমি ত এমনিতেই মাছ মাংস খেতাম না, ইউরোপের সিদ্ধ মাছ মাংসে যা দুর্গন্ধ—সব কিছুতেই সেই গন্ধ, বমি ঠেলে আসত। অন্যেরা অবশ্য খুব ভালভাবে খেত। একদিন ইংলণ্ডে এক লর্ডের বাড়িতে একটি মেয়ে কাঁচা মাংসই মুখে পুরে দিল। আমার এত খারাপ লাগল বল্লাম "রাক্ষসী, কাঁচা মাংস খাচ্ছ! আমাকে ছুঁতে পারবে না।" মেয়েটি ত বাংলাভাষা এক অক্ষরও বুঝল না, উল্টে এও এক রকমের আদর মনে করে আমার কাঁধে উঠে বসল আর দাড়ি ধরে টানতে লাগল। তবে ইংলণ্ডে মুড়ি বেশ পেতাম আর চিবতাম। আমাদের দলের অনেকেই বেশ মুড়িভক্ত হয়ে উঠল। দুধ আর দইও খুব ভাল পেতাম।

আমি ওদের ভাষা জানি না, তবে সেজন্য বেশি অসুবিধে হয়নি। উদয়রা অনেকেই ফরাসী, জার্মেন, ইংরিজী ভাল জানে। উদয়ই আমার দোভাষীর কাজ করত। বুদাপেস্ট, ভিয়েনা, প্যারিসে অনেক গুণী গাইয়ে বাজিয়েরা আমার সঙ্গে গানবাজনা নিয়ে আলোচনা করতে আসত। উদয় আমাদের কথাবার্তা সব বুঝিয়ে দিত। তবে ওদের ভাষা জানি না বলে দুঃখ হত। উদয়ের সঙ্গেই সব জায়গায় বেড়াতাম, ও আমাকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিত। ওদেশের হোটেলে চাকর চাকরাণীরা খুব ভাল আর চালাক, যা দরকার হাত পা নেড়ে বুঝিয়ে দিয়েছি, ওরা তা করে দিয়েছে। একদিন ত এক হোটেলে ভীষণ ক্ষিদে পেল—ম্যানেজারকে ফোনে ডাকলাম, কিন্তু কিছুতেই বোঝাতে পারিনা ক্ষিদে পেয়েছে। সে কি চীৎকার—বুঝতে না পেরে ম্যানেজারটা খালি চেঁচায়। ভয়ে ত আমি ফোন ছেড়ে দিলাম। তারপরেই ম্যানেজার সোজা আমার ঘরে এসে হাজির। তখন হাত দিয়ে দেখিয়ে সব বোঝালাম।

বম্বে থেকে জাহাজে উঠে প্রথমে এলাম পোর্ট সৈয়দে। জেরুজালেম, জাফা, একার, স্মার্ণা, প্রভৃতি সহরে আমাদের শো হল। ঘরে আর লোক ধরার জায়গা হত না। উদয়ের নাচ, আমাদের কনসার্ট

আর সেতার সরোদ সব দেখে শুনে লোকেরা মুগ্ধ হত, রোজ কাগজে আমাদের শো'র আলোচনা আর ছবি বেরত। উদয়ের নামত সবার মুখে মুখে। আমরা বেরলে চারদিকে ভীড় লেগে যেত, সবাই জায়গা ছেড়ে দিত। বাসে বা গাড়িতে বৃদ্ধ বলে আমাকে হাত ধরে উঠিয়ে বসিয়ে দিত। একবার এক মহিলা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমার ভারতের সংস্কার। খালি হাত পিছিয়ে নেই। মেয়েটি ততই এগোয়। আমিও খালি পেছই। কিন্তু মহিলাটি দস্তুরমত পালোয়ান। আমাকে ধরে ফেলে টেনে বাসে তুলে জায়গা করে বসিয়ে দিল। পরে এরকম আরও হয়েছে, তখন আর সঙ্কোচ হয়নি।

জেরুজালেমের লাটসাহেব আমাদের এক বড় ভোজে নেমতন্ন করেন। সেখানে তিনি খুব সুন্দর বক্তৃতা দেন। ভারতের সংগীত ও নৃত্যের খুবই প্রশংসা করেন।

প্যালেস্তাইন থেকে গেলাম মিশর—পিরামিডের দেশে। নবাব বাড়ির বেগমরা সব শো দেখতে আসতেন, আর শো হয়ে গেলে বহুক্ষণ উদয়ের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিন্তু বড় দুঃখ আমরা মক্কাশরীফে যেতে পারলাম না। আমি পারতাম, কিন্তু আমাদের দলে যারা মুসলমান নয় তাদের ঢুকতে দেবে না বলে আমি আর যাইনি। তবে প্যালেস্তাইন, তুর্কী, মিশর অঞ্চলের মুসলমানদের দেখে বুঝেছি আমাদের দেশের মুসলমানদের থেকে তারা কত পৃথক। মোল্লাদের লম্বা দাড়ি নেই। কিন্তু কী সুন্দর তারা কোরাণ পড়ে, আজান দেয়। যেমন সুন্দর উচ্চারণ, তেমনি হৃদয়ে ভক্তি। দেশের মোল্লাদের শিক্ষায় মনে হত ইসলামে বুঝি সংগীতের স্থান নেই। কিন্তু ওদেশে সংগীতের অনাদর নেই, ওদের গ্রামের ছেলেমেয়েদের কী সুন্দর সব নাচ গান রয়েছে। উদয়ের সব নাচেই হিন্দুদের দেবদেবীর কথা। কিন্তু তবুও সব শ্রেণীর মুসলমানরাই তার নাচ দেখে আনন্দে প্রশংসায় মুখর। ওদের প্রাণে গান রয়েছে। আর তাদের লম্বা চওড়া লাল সুন্দর চেহারা, সুন্দর পোষাক, উন্নত শিক্ষা দীক্ষা—আমাদের দেশের মুসলমানদের চেয়ে তারা অনেক সুন্দর, অনেক বড। সেদেশের মেয়েরাও বোরখা ফেলে দিয়ে পুরুষদের সঙ্গে বাইরে কাজ

করছে—তাদেরও সুন্দর স্বাস্থ্য আর প্রচুর খাটবার শক্তি। আমাদের দেশের মোল্লাদেরও যদি একবার আরব তুর্কী ঘুরিয়ে আনতে পারতাম, তাহলে এদেশের মুসলমানদের দুরবস্থা কমে যেত—দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হত না।

মিশর থেকে গেলাম গ্রীসে। গ্রীস খুব পুরনো দেশ। মিশর ভারত চীনের প'রই তার সভ্যতার জন্ম। কত বড় বড় কবি, শিল্পী, পণ্ডিত ওদেশে জন্মেছে। গ্রীসে একমাস ছিলাম। হাজার হাজার লোক উদয়ের নাচ দেখতে আসত। আর কাগজে কত ছবি, কত প্রশংসা। সেখান থেকে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গারী, অষ্ট্রীয়া, পোল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, সুইডেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বড় বড় সহরে প্রায় চার মাস ধরে শো হয়। সবখানেই যেমন প্রশংসা তেমনি সম্মান, রাজরাজড়া, মন্ত্রী প্রেসিডেণ্টদের পার্টি, খবরের কাগজ ভর্তি ছবি, আর সব থিয়েটারে দর্শকদের ভীড়। উদয় স্টেজে এলেই হাততালিতে ঘর ভেঙ্গে যাবার জোগাড় হত, ফুলের তোড়ায় আসর ভরে যেত। রাত্রে যখন ষ্টেজ থেকে হোটেলে ফিরতাম, দেখতাম দলে দলে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, উদয়কে দেখবে বলে। ইউরোপের সর্বত্রই এরকম ভীড় জমে যেত, এক লণ্ডন ছাড়া।

ভিয়েনা, প্যারিস, প্রাগ, বুদাপেস্ট প্রভৃতি সহরে সংগীত ও শিল্পের বিশেষ সমাদর দেখলাম। এসব সহরে আলাদা মিউজিক হল আছে। ঘরের এমন ব্যবস্থা, যে কোন জায়গা থেকে সংগীতের সূক্ষ্মতম ঝংকারও শোনা যায়। এক একটি হলে দশ বার হাজার লোক বসতে পারে। গানবাজনা আরম্ভ হলেই চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সব আলোও নিবিয়ে দেওয়া হয়, শুধু একটি ক্ষীণ রশ্মি আমার উপর পড়ে। হল এত নিস্তব্ধ থাকে, মনে হয় যেন হিমালয়ের কোন এক গুহায় বসে বাজাচ্ছি। কিন্তু শেষ হয়ে গেলেই চীৎকার আর হাততালি। "আবার বাজান আর একটা রব।" একসঙ্গে চার পাঁচবার বাজাতে হয়েছে, তবুও বলে "আরও বাজান!" এমন শ্রোতার কাছে বাজাতে, সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমার খুব

উৎসাহ হত। তন্ময় হয়ে বাজাতাম। এমন আত্মহারা হয়ে দেশেও কোথাও কখনো বাজাইনি। আমার কাঠের যন্ত্র প্রাণবান হয়ে উঠত। ইউরোপের শ্রোতাদের কাছে বাজিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি, এমন আর কোথাও পাইনি।

প্যারিসে এক্চ্যালিয়া হোটেলে আমরা ছিলাম। ছিলাম প্রায় এক মাস। সেখানে ভারতবর্ষের সব বাজনার একটা প্রদর্শনী হয়। আমাদের দলে প্রায় সব রকম যন্ত্রই ছিল। অনেক লোক যন্ত্র দেখতে আসত। বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েও থাকত। কেমন করে বাজাতে হয়, কী নাম, কী ইতিহাস—কত কৌতূহল তাদের। ছবি নিয়ে যেত। ভারতের সংগীত সম্বন্ধে প্যারিসের লোকের খুবই উৎসাহ। আমাদের সংগীত যে খুব সূক্ষ্ম প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তোলে তা ওরা বুঝতে পারত। এসব দেখেশুনে আমার বড় আনন্দ হত, আর ভাবতাম একদিন সারা পৃথিবীর জ্ঞানীগুণীরা আমাদের সংগীতের মর্ম বুঝবে।

একদিন হোটেলে কয়েকটি আমেরিকান আর ইউরোপীয়ন যুবতী এল। তারা আমার সরোদ শুনবে। আমেরিকান মেয়েরা হুজুকে। ভাবলাম এখন ওদের মহলে ওরিয়েন্টাল মিউজিকটাই ফ্যাশন, তাই বোধ হয় একটু গল্প করার মত শুনে যেতে এসেছে। তখন বিকেল তিনটে। বিরক্তির সঙ্গে ধরলাম ভীমপলশ্রী। আরম্ভের সঙ্গেই দেখলাম—না, এরা ত সেরকম মেয়ে নয়। খুব মন দিয়ে শুনছে, সুরের ভিতরে ঢুকতে চাইছে। বড় ভাল লাগল। তন্ময় হয়ে তিন-ঘণ্টা বাজালাম। ছটার সময় চেয়ে দেখি ওরা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে রয়েছে আর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। কান্না আর থামে না। গলাবন্ধ। পরমুহূর্তেই ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেতে লাগল।

ইউরোপে অনেক সংগীতজ্ঞের সঙ্গেই আলোচনা হয়েছে। তারা আমাদের সংগীত সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে চাইত। আমাদের রাগরাগিণীর অন্তরের ভাবগুলি কী, সে সব বোঝাতাম। তারা প্রায়ই জিজ্ঞেস করত আমি নিজে কিছু সংগীত কম্পোজ করেছি কিনা। ভারতের রাগরাগিণী ত কেউ ইউরোপের মত কম্পোজ করেনি। সেই কোন যুগে ঋষিরা তা ভগবানের কাছে থেকে

পেয়েছেন। একথা তাদের বলতাম। বলতাম দিনের এক এক ভাগের জন্য এক একটি রাগরাগিণী আছে। তাদের অন্তরে এক এক ভাব। সংগীতের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের মনের কত ভাব প্রকাশ করি। ভাষার দরকার হয় না, তারের ঝঙ্কারেই ভাব প্রকাশ করতে পারি, সবাই তা বুঝতেও পারে। এসব কথা তাদের সরোদ বাজিয়ে বাজিয়ে বোঝাতাম। একদিন বুদাপেস্টে একদল সংগীতজ্ঞ গুণী বল্লেন সরোদ বাজিয়ে আমার বক্তব্য বোঝাতে। তখন বিকেল পাঁচটা, আর তিনঘণ্টা পরে সন্ধ্যা হবে। ধরলাম ভৈরবী। সবাই চোখ বুজে মন দিয়ে শুনল। বাজনা শেষ করে বল্লাম—কী বুঝলে ? একজন বল্ল, মনে হল গির্জেয় বসে প্রেয়ার করছি। আরেকজন বল্ল, মনেহল ভোর বেলা একলা বসে ভগবানের উপাসনা করছি। একের পর এক ভোর বেলা থেকে শেষরাত্রি পর্যন্ত নানা সময়ের নানা রাগরাগিণীর আলাপ শোনালাম,—আমাদের সংগীতে প্রহরের নানাভাব যে বোঝান যায় একথা সবাই স্বীকার করল। ভীমপলশ্রীকে একজন বল্ল, এসুর বড় কান্না আসে। তোমাদের সংগীতে এত করুণ সুর কি করে সম্ভব হয় ? এত কান্না আসে কেন ?

আমাদের সংগীতে সাতটি সুরের বাইশটি শ্রুতি। একুশটি মূর্ছনা আছে; সা থেকে রে—এর মধ্যেই চারটে ঘাট। আমরা যে এই চারটি শ্রুতিকে আলাদা করে ধরতে পারি, একথা তারা বিশ্বাস করতে চায়নি। শেষকালে বাজিয়ে দেখালাম। ওরা অবাক হয়ে বল্ল, তোমাদের কান এত সব সূক্ষ্ম ধ্বনির পার্থক্য ধরতে পারে ? আমি বল্লাম, পারে বলেইত আমাদের রাগরাগিণী এত সুরেলা। তাতে কাটা কাটা খাপছাড়া আওয়াজ হয় না।

আমি ওদের বল্লাম, তোমাদের তিন প্রকারের তাল ও টাইম। আমাদের তিনশ যাট তাল পর্যন্ত আছে। চৌতালা, ঝাঁপতাল, সুরফাঁক, ধামার আড়াচৌতাল আরও তাল শোনালাম।

বুদাপেস্টের সেদিনের আলোচনায় একজন পৃথিবী বিখ্যাত

বেহালা বাদকও ছিলেন। তাঁর আঙ্গুল চালানর কী অদ্ভুত ক্ষমতা, যেমন দ্রুত তেমনি পরিস্কার। কিন্তু তাতে তেমন মেলডি আসে না। আলোচনা খুব জমেছিল, রাত বারটা বেজে গিয়েছিল। আমাদের অন্যসব কাজকর্ম দেখাসাক্ষাত কোথায় উড়ে গেল। ওরাও ওদের সব কাজকর্ম ভুলে গিয়ে খুব মন দিয়ে, আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ করে সেদিন যে কী আনন্দ পেয়েছিলাম! ইউরোপের সব জায়গাতেই এরকম হয়েছে। শুধু বাঙালীরাই যে হুজুক ভালবাসে তা নয়। ইউরোপও কম হুজুক ভালবাসে না। ওরা অনেকেই আমাদের গান বুঝতে পারে না। কিন্তু ওদের অনেক সংগীতজ্ঞ, কবি, শিল্পী, শিল্প অনুরাগী আমাদের সংগীতের মর্ম অনুভব করেছে। একদিন ইউরোপ আমাদের সংগীতের আদর করবেই।

তবে আমার ওদের দেশের গান ভাল লাগে না: বড় কর্কশ, বড় চীৎকার। এই বুঝি মারামারি স্নুরু করে। কাবুলীদের গানেরও এককাঠি উপরে। সংগীতের দেশ মিউনিকে আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু মিউনিক, বার্লিনে আমাদের ইহুদী ম্যানেজার সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকত তাই কোনও শো হতে পারেনি। তবে হোটেলে এসে অনেকেই বাজনা শুনত। ইটালীতেও শো হয়নি, তখন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, দেশের টাকা বাইরে নিয়ে যাবার অনুমতি নেই। আমরা রোম, ফ্লোরেন্স, ভিনিস সব ঘুরে দেখলাম। রাশিয়ায় যাবারও অনুমতি পাইনি। আমি ভারতে এসেছিলেন দলের আগেই। রবু চিঠি লিখল জার্মানীতেও শো হবে, ইহুদী ম্যানেজার আর নেই, উদয়রা তারপরে আমেরিকা যাবে।

ইংলণ্ডে আমরা অনেকদিন ছিলাম, একনাগাড়ে তিনমাস। গুরুদেবের শিষ্য এলমহার্স্ট এই গুরুদেবের শিক্ষার আশ্রমের মতই সেই আদর্শেই ডিভনসায়ারে এক বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছেন, তার নাম ডার্টিংটন হল। আমরা সেখানেও ছিলাম। সেখানে এখানকার মতই অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের পেয়ে আমি যেন প্রাণ পেলাম। আমার সঙ্গে তাদের খুব ভাব হয়ে

গেল। কাঁধে চড়ে, দাড়িটানে, কিল ঘুষি মারে আর চুমু খেয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

আমি উদয়কে বিদেশে একবছর থাকব এ কথাই বলে গিয়েছিলাম। বছর শেষ হতে দেশে ফিরলাম। আমাদের আগে তিমিরবরণ ইউরোপ গিয়ে মাতিয়ে এসেছিল। সে আমারই ছাত্র। তার ইউরোপে অনেক জায়গায় প্রশংসা শুনে বড় আনন্দ হল। গৌরব হল। আমার নিজের তেমন সাধনা নেই। সুরের সৃষ্টি করে শ্রোতার মনে মোহ জন্মাতে পারি না। রাজা বিক্রমাদিত্য মধ্যরাত্রিতে দীপক রাগিণী বাজাতেন, প্রদীপ জ্বলে উঠত, রাগরাগিণীর সাহায্যে শীত বসন্ত বর্ষা ডেকে আনতেন। আমাদের সংগীতে এরকম ক্ষমতা সত্যিই আছে। আমার সাধনা নেই, তাই আলোও জালাতে পারি না, বসন্তও আনতে পারি না। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ বিদ্যাতেই আমার বাজনা ইউরোপে আদর পেয়েছে, তাতে আমাদের সংগীতের যে কী মহত্ব তা এতেই বোঝা যায়। যদি আমার সাধনা পুরো হত তবে আমাদের সংগীতের যে পরিচয় দিতে পারতাম তবে পশ্চিমের সব সভ্যজাত মাত হয়ে যেত।

ইউরোপে অনেক কিছু দেখলাম। তখন জার্মেণীতে হিটলার, ইটালীতে মুসোলিনী। চারিদিকে যুদ্ধের হুমকি। আমি রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু আরব প্যালেস্তইন থেকে সুরু করে ইউরোপের সর্বত্র দেখলাম আধুনিক সভ্যতার পরিচয়। আমাদের দেশ তখন দারিদ্র্যে, অশিক্ষায় কত পেছিয়ে ছিল। হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া, ব্রাহ্মণ শূদ্রে ছোঁয়াছুঁয়ির মানা, এমন অন্ধতা। আর পশ্চিম তখন সভ্যতায়, শিক্ষায়, জ্ঞানে কত এগিয়ে গেছে। কে বলে ইউরোপ যন্ত্রসভ্যতার দাস, জড়বাদী। তাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তিও তারা বাড়িয়ে তুলেছে। সেখানে মানুষ মানুষের মত বাঁচতে শিখেছে আর আমরা নির্জীব তামসিকতায় আচ্ছন্ন।

আমি বুড়ো মানুষ, সেকেলে লোক। ইউরোপের মেয়ে পুরুষের আচার ভাল লাগবে না মনে হয়েছিল। কিন্তু নিজের চোখে দেখে ভুল ভাঙল।

চরিত্রহীন এদেশে ওদেশে সব দেশেই আছে। কিন্তু আমরা যাদের দেখেছি, যাদের সঙ্গে মিশেছি তারা ইউরোপ সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে দিয়েছে. ইউরোপের প্রতি শ্রদ্ধাই বেড়েছে। এল্‌মহার্স্টের মেয়ে বিয়াত্রিস তারপর এলিস বোনার —রা দেবীতলা। ভারতের প্রতি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়।

আমরা ইউরোপের যা দেখছি তাতে অসুন্দর খারাপ কিছু চোখে পড়েনি। এখানে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা. স্নান, সমুদ্রের ধারে রোদে শুয়ে থাকা, খেলাধুলা, নাচগান, ব্যায়াম এতটুকুও বিসদৃশ মনে হয়নি, অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক সুন্দর। ওদের মেয়েরা যেমন কাজেকর্মে চতুর, তেমনি শিক্ষাদীক্ষায় পারদর্শী। হোটেলের ঝিরাও বিদ্যাবুদ্ধিতে আমাদের অনেক আই, এ বি, এর সমান। তারা সময় পেলেই বই পড়ে, খবরের কাগজ পড়ে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতেও অভ্যস্ত, অবশ্য আমাদের গ্রামের বউঝিদের মত অত খাটতে হয় না। আর তাদের শরীর—ভাল কথায় বলতে হয় স্বাস্থ্যবতী, নইলে বলা যায় মহিষমর্দিনী—এখানে কেউ নেই ত? তাইত ওরা কাজে কর্মে বীরত্বে সারা পৃথিবী চালাচ্ছে। ওদের ছেলে মেয়েরা কী সুন্দর, দেখলে আদর না করে পারা যায় না—যেন পরী, দেবশিশু। ইউরোপের মেয়েদের এত প্রশংসা করলাম—আমাদের মা বোনেরা রাগ করছেন। তবে আমার তিনকাল পার হয়েছে। বুড়ো হয়েছি। আর ওর সবাই আমার নাতনীর বয়সী। ইউরোপে সবাই আমাদের দেশ সম্বন্ধে বড় জানতে চায়, মহাত্মা গান্ধী, গুরুদেবকে সবাই জানে। আমাদের সঙ্গে যাদের আলাপ হয়েছে, তারা সবাই গুরুদেবের বড় ভক্ত। তবে লণ্ডনে আমাদের দেশ সম্বন্ধে অত কৌতূহল দেখিনি।

আমি পারিস থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসি। উদয় বল্ল ওস্তাদজি, ভারতবর্ষকে আমার প্রণাম জানাবেন। আমি 'ভারতবর্ষের' মধ্য দিয়ে উদয়ের প্রণাম ভারতবাসীকে জানিয়েছিলাম। উদয় বিদেশে দেশের মান বাড়িয়েছে। সে যে শুধু বড় নৃত্যশিল্পী তাই নয়, তার সৎসাহস ও ব্যক্তিত্বের মর্যাদাও খুব। একবার লণ্ডনে

আমি উদয় আর একজন ফরাসী মহিলা যাচ্ছি। একজন ইংরেজ পথে যেতে হঠাৎ ফরাসী মেয়েটির গায়ে ধাক্কা মেরে চলে গেল। উদয় তক্ষুনি লোকটির ঘাড় ধরে টেনে এনে মেয়েটির কাছে ক্ষমা চাইতে বল্ল, লোকটি অস্বীকার করায় ঘুসি মেরে তাকে পথে ফেলে দিল। লোকটি উঠে, ধুলো ঝেড়ে, দিব্যি খুসি মনে চলে গেল। লোক যারা জমেছিল, তারা কেউ লোকটিকে সাহায্য করতে এল না, লোকটিও তাদের সাহায্য চাইল না।

উদয় দেশে ফিরে প্রথমে, কাশীর কাছে একটি নাচ গানের বিদ্যালয় খুলবে ঠিক করে। পরে সেটি আলমোড়ায় হয়েছিল। বিয়ত্রিসে এবং এলিস বোনার এর জন্যে উদয়কে অনেক সাহায্য করেছিলেন। উদয় বিদেশে নাচ দেখিয়ে অনেক টাকা পেত, কিন্তু দলের খরচে তার ত কিছুই থাকত না। বিয়ত্রিসে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আর রেকর্ড, বাজনা, সাজ, পোষাক কত কী দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে সে সব দেশে চলে এল। বিয়ত্রিসে আর বোনার উদয়কে যে কত সাহায্য করেছেন তা বলা যায় না। আমাদের দেশের শিল্প সংস্কৃতির প্রতি এঁদের ভক্তি অসীম। উদয়ের দলের বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থায় এঁদেরও অনেক সহায়তা আছে। উদয় ছাড়াও আরও কত প্রতিষ্ঠানে যে এঁদের দান আছে!

আমি যে একবছর বাইরে ছিলাম, আমার প্রভু মাইহারের রাজাসাহেব আমার প্রাপ্য টাকা গুণে গুণে দিয়েছেন। আমার পরিবারের জন্য যে পরিমাণে পরিশ্রম করেছেন, দেখাশুনা করেছেন, দেওয়ান সাহেবের জন্যও তা হয় না।

আমার বিদ্যাবুদ্ধি অল্প। ইউরোপে কত কী দেখেছিলাম, তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। কেবল সংগীত সম্বন্ধে আমার টুটা ফুটা ভাষায় কিছু বল্লাম। এবার উঠি রাত হল।

একথা বল্লাম আমার জীবনী বলে না। তোমরা সব দেখ কী কষ্ট করে সংগীতের সাধনা করতে হয়।



রত্নসাগর গ্রন্থমালা